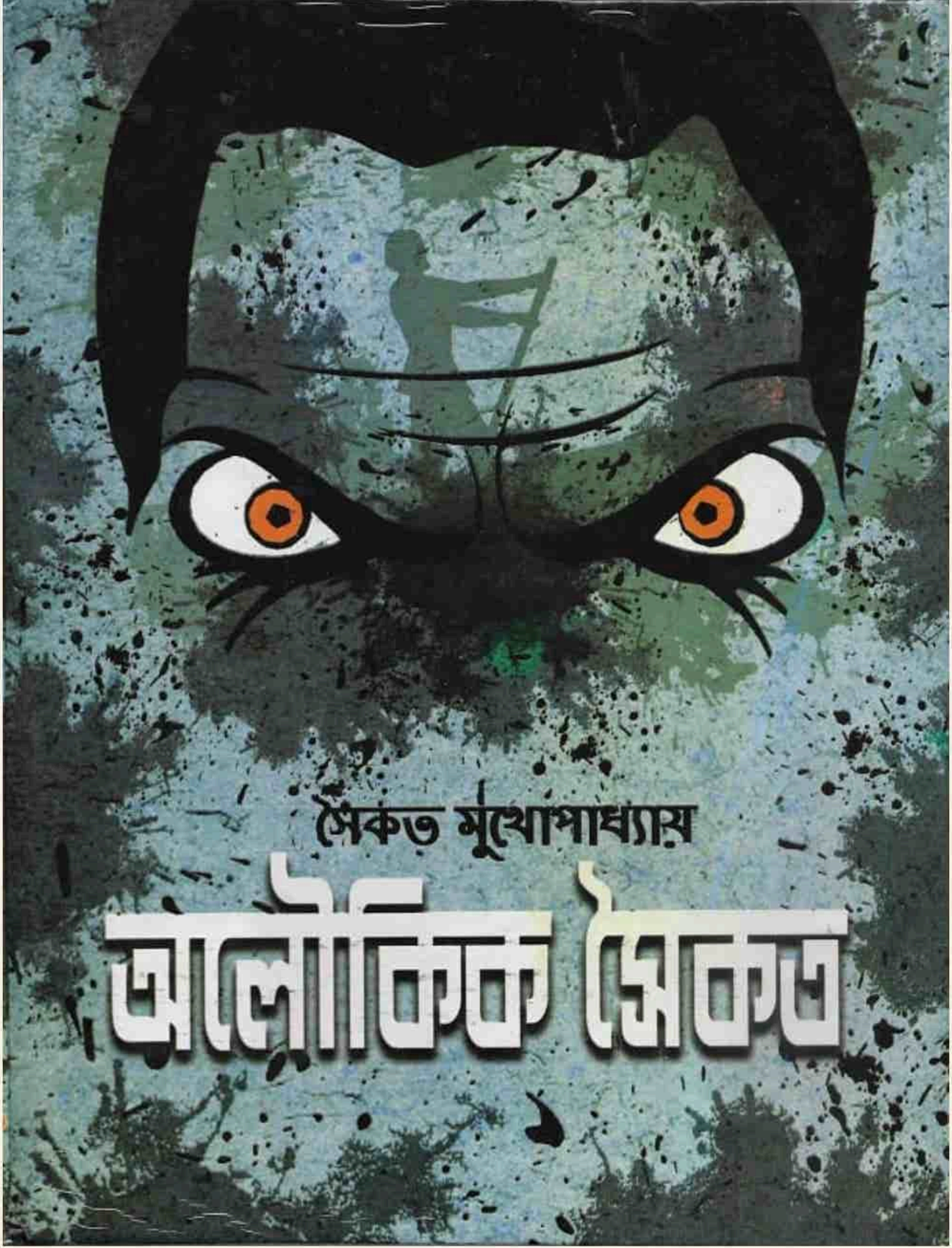

সৈকত মুখোপাধ্যায়
অলৌকিক সৈকত

অলৌকিক সৈকত

সৈকত মুখোপাধ্যায়

নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি কলেজ রো □ কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

ধরুন সমুদ্রের তীর ধরে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, একা। ভ্রমণার্থীদের হাসি, গান, রৌদ্রস্নানে জমজমাট আপনার অনেকদিনের চেনা—সৈকত ধরে যেতে—যেতে হঠাৎই দেখলেন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখানে আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই। হঠাৎই পালটে গেছে সমুদ্রের জলের রং। ঢেউয়ের পর ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে ঠিকই, কিন্তু শব্দ উঠছে না এতটুকু। পায়ের নিচে বালিও আর সোনালি নয়, তার রং রক্তের মতন লাল। এমনকি মাথার ওপরের আকাশটাও নীল থেকে হঠাৎই অন্ধের চোখের মতন সাদা।

আপনি ভয় পাবেন। আপনি বুঝতে পারবেন, নিজের অজান্তেই পা দিয়ে ফেলেছেন এক অলৌকিক সৈকতে।

এই ভয়ের বারোটা গল্প এমনই অলৌকিক। চেনা জীবনের মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে এই বইয়ের চরিত্রেরা হঠাৎই মৃত্যুর পরের জগতের একঝলক দেখতে পেয়ে অবশ হয়ে যায়।

আপনাকে যদি তাদের সেই হিমশীতল অভিজ্ঞতার কিছুমাত্র ভাগ দিতে পারি তাহলেই আমি ধন্য।

সৈকত মুখোপাধ্যায়

সল্টলেক।

সূচি

বিরামগড়ের বন্দি



এক

মুম্বই থেকে কোলহাপুরের দিকে চলে গেছে যে ঝাঁ চকচকে হাইওয়েটা, তারই মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটা শহর, নাম আক্কানাদ। এই আক্কানাদ থেকে একটা সরু রাস্তা হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে ঢুকে গেছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার যাওয়ার পর সোজা রাস্তাটা হঠাৎই পাক খেতে খেতে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে চড়তে শুরু করেছে। শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানেই শিবাজি মহারাজের আমলের দুর্গ, বিরামগড়।

দুর্গের পাথুরে পাঁচিলটা চল্লিশ ফুট উঁচু আর সব মিলিয়ে আড়াই কিলোমিটার লম্বা। এই পাঁচিলঘেরা বিরাট

চৌহদ্দির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পনেরো ষোলোটা ছোট বড় পাথরে তৈরি বাড়ি। পেশোয়াদের আমল অবধি তার মধ্যে কোনোটা ছিল বারুদখানা, কোনোটা ঘোড়ার আস্তাবল, আবার কোনোটা রানিমহল। পাহাড়ের চূড়ার কাছে যে বাড়িটা, সেটাই সবচেয়ে বড়। ওটাই না কি ছিল দুর্গাধিপতির অফিস—কাম—রেসিডেন্স। এই বাড়িটার ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন পি.কে. ঘোষাল। প্রণবকুমার ঘোষাল। ফেরারি গ্রুপ অফ হোটেলস—এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রণব ঘোষাল ছাদের পাঁচিলের ওপর হাত রেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার পায়ের নিচে মাইলের পর মাইল ঘন জঙ্গলের সবুজ চাদর। সামনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। জঙ্গল আর পাহাড়ের ওপর গোলাপি, লাল, গেরুয়া, কমলা কত রকমের রং—ই যে একে একে ছড়িয়ে পড়ছিল তা আর বলে শেষ করা যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে টিয়াপাখির ঝাঁক ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজে সেই নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দিয়ে, দুর্গের দেয়ালের অসংখ্য ঘুলঘুলি আর ফাটলের মধ্যে তাদের লুকোনো বাসায় যাওয়া আসা করছিল। তা ছাড়া নিচের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে ময়ূরের কর্কশ চিৎকার। এছাড়া কোথাও আর কোনো আওয়াজ ছিল না।

খুব ভালো লাগছিল ঘোষাল সাহেবের। বহুদিন তিনি একা এমন শান্তভাবে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পাননি। বহুদিন তিনি সূর্যাস্ত কিংবা সূর্যোদয় দেখেননি।

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে তার দিন কাটে। সারা ভারতে মোট এগারোটা হোটেল রয়েছে ফেরারি গ্রুপের। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে সেই এগারোটা শহরে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয় তাকে, আর সবসময়েই তার পেছন পেছন ফাইল হাতে নিয়ে দৌড়য় ফেরারির ম্যানেজমেন্টের আরও চার পাঁচজন অফিসার। তারই মধ্যে আজ হঠাৎই এরকম একটা অকাজের দিন তার হাতে চলে এসেছে। আজ যে শুধু হাতে কাজ নেই তাই নয়, একজন ছাড়া আর কোনো সহকর্মীও নেই সঙ্গে।

মানুষের গলার আওয়াজে নিচের দিকে তাকালেন প্রণব ঘোষাল। ওই যে সেই সহকর্মীটি। ফেরারি গ্রুপের সেকেন্ড—ইন—কম্যান্ড, চিফ অ্যাকাউন্টান্ট সুধাকর আপ্তে। প্রায় চার তলার উচ্চতা থেকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, আপ্তেও আজ মুডে আছে। এমনিতে শেভিল রোর থ্রি পিস স্যুট ছাড়া যাকে দেখা যায় না, সেই সুধাকর আপ্তে রংচঙে হাওয়াই—শার্ট আর বারমুডা পরে, প্রবল বেগে হাত পা নাড়তে নাড়তে চড়াই রাস্তাটা ধরে উঠে আসছে। ওর সঙ্গে মনুয়া বলে ছেলেটা রয়েছে। মনুয়া এই দুর্গের রাঁধুনি। ওকে নিয়ে আপ্তে জঙ্গল ভেঙে দু কিলোমিটার দূরে একটা ঝরনা দেখতে গিয়েছিল। ঘোষালসাহেবের শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে উনি যাননি। এখন ওরা ফিরছে। ঘোষালসাহেব দেখলেন, মনুয়ার মাথায় একটা ছোট ঝুড়ি।

আপ্তে আর মনুয়া যখন দুর্গের দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন ঘোষালসাহেব ওপর থেকে হাঁক

ছাড়লেন — ঝুড়ি ভরে ওসব কী নিয়ে এলে আপ্তে?

ছাদের দিকে মুখ তুলে সুধাকর আপ্তে বলল, মাশরুম স্যার, লোকাল মাশরুম। যাকে বলে ব্যাঙের ছাতা। মনুয়া ঝরনার ধার থেকে তুলে আনল। আজ রাতে ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে চিকেন উইথ মাশরুম। রেসিপি—টা আমি মনুয়াকে বলে দেব। একবার খেয়ে দেখবেন, আপনার এগারোটা হোটেলের একটারও শেফ ওরকম বানাতে পারে কি না।

আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন। আপাতত তুমি চটপট ওপরে উঠে এসো। ফ্যানটাসটিক সানসেট হচ্ছে।

আপ্তে জবাব দিল, মাফ করবেন স্যার। অনেক চড়াই ভেঙেছি। আর ওই খাড়া সিঁড়িগুলো টপকাতে পারব না। আর, আমি তো মহারাষ্ট্রেরই লোক। অমন সানসেট অনেক দেখেছি। আপনি এনজয় করুন।

আপ্তে মনুয়াকে নিয়ে দুর্গের একতলায় ঢুকে পড়ল।

প্রণব ঘোষাল আবার সামনের দিকে তাকালেন। সব রং মুছে গিয়ে এখন শুধু অদ্ভুত একটা বেগুনি আভা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়গুলোর গায়ে। অন্ধকার নেমে আসছে। পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে এক এক মুঠো আলো জ্বলে উঠেছে। ওগুলো পাহাড়ি মানুষদের গ্রাম।

ওগুলোই কি সেই ভীল উপজাতির মানুষদের গ্রাম, যারা ছিল শিবাজির আসল শক্তি? মনে মনে ভাবলেন প্রণব ঘোষাল। ভাবতেই তার রোমাঞ্চ হল। আড়াইশো বছরে এখানে প্রায় কিছুই পালটায়নি। ওই পাহাড় জঙ্গল, ভীলদের গ্রাম। এই দুর্গ। সবকিছুই প্রায় একরকম রয়েছে।

মনে হয় কান পাতলে এখনই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাবে। শোনা যাবে কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বার করার ধাতব শব্দ। আর এইটাই হবে হোটেল বিরামগড়ের অন্যতম আকর্ষণ।

কথাটা ভাবতেই ঘোষালসাহেবের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। ইয়েস। ঠিক এইজন্যেই বিরামগড় দুর্গ হতে চলেছে তার ফেরারি গ্রুপ অফ হোটেলস—এর বারো নম্বর হোটেল। অনেক টাকা খরচা করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই ছোটখাটো দুর্গটাকে তিনি কিনেছেন। এবার এটাকে হেরিটেজ—হোটেলে কনভার্ট করবেন। বেশি কিছু বদলাবেন না। পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা, কামান, বন্দুক সবই থাকবে। যে ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে শত্রুদের গায়ে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়া হত থাকবে সেগুলোও। ওসবের সঙ্গে অ্যাড হবে লাক্সারি। এয়ার কন্ডিশনিং, স্পা, ব্যাঙ্কোয়েট, জিম — এইসব আর কী।

আর হ্যাঁ, দুর্গের মালিক জীবনদেব কেলকার সাহেবের আমলের লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে কলকাতা থেকে ট্রেনড স্টাফ আনতে হবে। কিন্তু আশা করা যায় তাতে এই দুর্গের গায়ে জড়িয়ে থাকা যুদ্ধবিগ্রহের গন্ধ, এর গা ছমছমে ভাব —টাবগুলো নষ্ট হবে না। ওইগুলোর জন্যেই তো ফরেনাররা আসবে এখানে। যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম—সেই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের টানে।

দুই

কোলহাপুর থেকে কেলকার সাহেবের এখানে আসবার কথা ছিল আজ দুপুরে। দুর্গ বিক্রির কন্ট্রাক্ট সই হবে।

যোলো কোটি টাকা ফেরারির অ্যাকাউন্ট থেকে কেলকার সাহেবের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এরকমই কথা ছিল। সেই মতনই বারোটা নাগাদ সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমেছিলেন পি.কে. ঘোষাল আর সুধাকর আপ্তে। কিন্তু একটার সময় হঠাৎ কেলকার সাহেবের ফোন। প্রচুর ক্ষমা টমা চেয়ে যা জানালেন, তা হল, ওঁনার এক আত্মীয় হঠাৎই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে নিয়ে উনি হাসপাতালে রওনা হচ্ছেন। কাজেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দয়া করে যদি আগামীকাল শিফট করা যায়।

এরকম ক্ষেত্রে 'না' বলাটা চূড়ান্ত অভদ্রতা হত। কাজেই ঘোষাল সাহেব আর আপ্তে রাতটা বিরামগড়ে কাটানোই ঠিক করলেন। এইভাবেই পড়ে পাওয়া ছুটিটা হাতে এসে গেল ব্যস্ত মানুষ প্রণব ঘোষালের।

সেটা প্রণব ঘোষালের পক্ষে একদিক থেকে ভালোই হল। কারণ, এর আগে তিনি একবার মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্যে বিরামগড়ে এসেছিলেন। তখন সবে জায়গাটা কেনার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। তারপর থেকে সুধাকরই এখানে এসেছে। সব মিলিয়ে প্রায় সাত আটবার হবে। ও এখানকার লোকজনকেও ভালোমতন চিনে গেছে। প্রণব ঘোষাল ঠিক করলেন কাল সকালবেলায় উনিও প্রপার্টিটা ভালো করে ঘুরে দেখবেন। তাহলে এর পর আর্কিটেক্টের লোকজনের সঙ্গে রিনোভেশন প্ল্যান নিয়ে কথাবার্তা বলতে সুবিধে হবে।

আপাতত ছাদ থেকে আর কিছু দেখার নেই। পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশের তারার সঙ্গে পাহাড়ের

গায়ে ছড়িয়ে থাকা ভীলগ্রামের প্রদীপের আলো মিশে গেছে। নিচে নামার জন্যে প্রণব ঘোষাল সিঁড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, আর তখনই তিনি দেখতে পেলেন বৃদ্ধ মানুষটিকে।

সিঁড়ির মুখেই লোকটা দাঁড়িয়েছিল। ধবধবে সাদা চুল আর দাড়ি। পরনে বিশুদ্ধ মারাঠি কায়দায় পিরহান আর ধুতি। কানে সোনার মাকড়ি, হাতে লোহার বালা। লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে ঘোষালসাহেবকে প্রণাম জানাল। মারাঠি টানের হিন্দিতে বলল, হুজুরের যদি খুব ব্যস্ততা না থাকে তাহলে একটু বসেই যান। যে দুর্গ খরিদ করছেন তার ইতিহাসটা আর আপনাকে কে বলবে, এই বুড়ো মাধবরাও শিরোদকর ছাড়া?

ঘোষালসাহেব এক মিনিট ভেবে নিলেন। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। যেমন চিতোরগড়ের সঙ্গে রানি পদ্মিনীর জওহর ব্রতের গল্প জড়িয়ে আছে সেরকম ইন্টারেস্টিং গল্প যদি বুড়ো কিছু বলতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে হোটেল বিরামগড়ের ব্রশিওরে সেটা ছেপে দেওয়া যেতে পারে। তিনি বললেন, না, তাড়া নেই। বলো কী বলবে।

বুড়ো প্রণব ঘোষালকে ছাদের একদিকে পড়ে থাকা একটা চারপাই দেখিয়ে সেটার ওপর বসতে ইশারা করল। নিজে বসল মুখোমুখি পাঁচিলের একটা ভাঙা অংশের ওপর। তারপর হঠাৎই অদ্ভুত একটা মন্তব্য দিয়ে তার কাহিনি শুরু করল। বলল, যে কোনো দুর্গের ইতিহাসই আসলে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। বীরত্ব দিয়ে দুর্গ জয়

করা যায় না। বিশ্বাসঘাতক দিয়ে দুর্গ খোলাতে হয়। বিরামগড়েও ছিল এরকম এক বিশ্বাসঘাতক।

তখন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের আমল। গোরা সাহেবরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে পুনে দখল করতে, কিন্তু তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ছোট্ট বিরামগড় দুর্গ। মাত্র একশো ঘোড়সওয়ার আর তিনশো পদাতিক সৈন্য নিয়ে দুর্গের অধিপতি যশোরাজ কেলকার যে লড়াইটা দিচ্ছেন তাতে ব্রিটিশদের চোখের ঘুম উড়ে যাওয়ার জোগাড়। দুর্গের নিচের ওই সরু পাহাড়ি খাতের মধ্যে দিয়েই তখন ছিল মুম্বাই থেকে পুনে যাবার একমাত্র রাস্তা। সেই রাস্তার ওপরে এই দুর্গ। ব্রিটিশরা একটা করে সৈন্যদল পাঠায় আর যশোরাজের সৈন্যরা ওপর থেকে গোলাবৃষ্টি করে তাদের নিপাত করে।

ব্রিটিশরা যে দুর্গ দখলের চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু সেটা তো অত সহজ কাজ ছিল না। দুর্গের তিনদিক ঘিরে পাহাড়ের খাদ। শুধু সামনের দিকে সরু একটা চড়াই রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে ব্রিটিশ সৈন্যদের উঠতে দেখলেই মারাঠা সৈন্যরা ওপর থেকে আগুনের গোলা, পাথর, ফুটন্ত তেল এইসব ছুড়তে শুরু করত। তাছাড়া আশে পাশের পাহাড়ে দুর্ধর্ষ ভীলরা তো ছিলই। চোরাগোপ্তা আক্রমণে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কত লোকের বুকে যে তারা তির ফুঁড়ে দিয়েছে তার হিসেব নেই।

সব শেষে ছিল বিরামগড়ের মূল ফটক। সে এক আশ্চর্য জিনিস, দেখেছেন তো হুজুর? ভেতর থেকে একটা দশ বছরের ছেলেও সেই তিরিশ ফুট উঁচু লোহার গুল বসানো

দরজা খুলে ফেলবে। কিন্তু বাইরে থেকে হাজার লোকে ঠেলেও সেই দরজাকে নড়াতে পারবে না।

হাতির কথা বলছেন? ওই ফটকের সামনে রাস্তাটা দেখেছেন? ঠিক ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ের মতন বাঁকানো। হাতি যাতে বিরাট শরীর নিয়ে ওই বাঁক পেরোতে না পারে সেই জন্যেই ওটা অমন করে তৈরি। তার ওপর সারা দরজায় ধারালো পেতলের গুল বসানো। হাতি মাথা দিয়ে ঠেললে মাথা রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

প্রণব ঘোষাল মনে মনে বুড়োর সমস্ত কথার নোট নিচ্ছিলেন। ওই ব্যাটা সুধাকর আপ্তে সাতবার এখানে এসেও এই সব ইন্টারেস্টিং তথ্য বার করতে পারেনি, আর তিনি মাত্র একবেলাতেই কত কিছু জেনে ফেললেন। একেই বলে 'লাক'।

দুর্গ জিনিসটা অত সহজ নয় হুজুর—বলে চলল মাধবরাও। কাল সকালে ভালো করে দেখবেন। দুরকমের সিঁড়ি আছে। একটা হাতি কিংবা ঘোড়ার ওঠা নামার জন্যে —চার হাত চওড়া একেকটা ধাপ। আরেকরকমের সিঁড়ির সরু ধাপ, মানুষদের জন্যে। এই বিরামগড়ের মাটির নীচে পাঁচশো লোকের একবছরের খোরাকি চাল ডাল মজুত করে রাখার মতন গোলা আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে যে ঝরনা নামছে তার জল ধরে রাখার জন্যে চার চারটে বড় তালাও আছে। অবরোধ করে বসে থাকবি? থাক না। কোনো অসুবিধে নেই।

প্রণব ঘোষাল তখনই মনে মনে ঠিক করলেন, ওই গোলাটাকে খুঁজে বার করে ওখানে একটা ক্যান্ডল—

লাইট বার খুলবেন। ওঃ, পরিবেশটা কেমন হবে জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না।

বুড়ো কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবল। তরপর বলল, শেষমেষ ব্রিটিশরা বহু চেষ্টার পর একজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করল। দুর্গের কর্মচারী ছিল লোকটা। প্রথমে সে দুর্গাধিপতি যশোরাজ কেলকারের খাবারে বিষ মেশাল। কিন্তু সে জানত না যশোরাজ বিষপাথরের থালায় ছাড়া খান না।

বিষপাথরটা কী জিনিস? জিজ্ঞেস করলেন প্রণব ঘোষাল।

সে এক আশ্চর্য পাথর হুজুর। তখনকার মুসলিম নবাবরা কোথা থেকে যে সে পাথর আমদানি করেছিলেন জানি না। সাধারণ মানুষ হীরে জহরত তবু চোখে দেখতে পেত, কিন্তু বিষপাথর চোখেও দেখতে পেত না, এমনই কিমতি সে জিনিস। বিষপাথরের থালায় বিষ—মেশানো খাবার দেওয়া মাত্র সাদা পাথর নীল হয়ে যেত। ওই বিষপাথরের থালার জন্যেই সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন যশোরাজ কেলকার।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জিনিসটা হল শরীরের ভেতরের অসুখের মতন। বেশিদিন বাঁচতে দেয় না।

কেন বলছ এ কথা?

বলছি কারণ, এরপর শেষ অস্ত্রটা বার করল সেই বিশ্বাসঘাতক। রাতের অন্ধকারে দুর্গের মূল ফটক খুলে দিল।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। দুর্গের পায়ের কাছের জঙ্গল থেকে কোনো বন্য জন্তুর চিৎকার ভেসে এল। প্রণব ঘোষাল গলা খাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

তারপর আর কী? এটা আঠেরোশো সতেরো সালের ঘটনা। তার পরের বছর পুরো মারাঠা সাম্রাজ্যটাই যে ব্রিটিশ কোম্পানির কবজায় চলে এল সে তো আপনারা জানেন।

আর সেই লোকটার কী হল? সেই ট্রেচারার?

পালাতে পারেনি। ইংরেজদের কাছ থেকে ইনাম পাওয়া আর হয়নি তার। দুর্গের সৈনিকরা নিজেরা মরার আগেই তাকে মেরে ফেলেছিল।

তবে একটা কথা বলি হুজুর। মৃত্যুর পরেও তার আত্মা কিন্তু মুক্তি পায়নি। এখনো সে বিরামগড়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। হয় তো প্রায়শ্চিত্তের পথ খোঁজে।

আপনারা এখানে হোটেল খুললে সে কোথায় যাবে জানি না।

চলি হুজুর। প্রণাম।

আবার ঝুঁকে পড়ে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সেই বুড়ো মানুষটা। প্রণব ঘোষাল চারপাইয়ের ওপর ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন, যদি সেই অভিশপ্ত বিশ্বাসঘাতক হোটেল চালু হওয়ার পরেও এই দুর্গে ফিরে ফিরে আসে? যদি এরকম হয় যে, হোটেলের কোনো গেস্ট রাতে জানলা দিয়ে দেখতে পেল এক ছায়া মূর্তি মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে চেষ্টা করছে বিশাল খিলটা খুলবার, কিন্তু ছায়ার শরীর

নিয়ে পেরে উঠছে না। কী হবে তাহলে? কোথায় পৌঁছে যাবে এই হোটেলের টি আর পি?

তিন

সাহাব, সাহাব, উঠিয়ে। খানা বন গিয়া। চলুন সাহেব, ডিনার সেরে নেবেন।

কানের কাছে ডাকাডাকি আর হাঁটুর ওপর হাতের ছোঁয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসলেন প্রণব ঘোষাল। ছাদের ওপর এই চারপাইটায় শুয়েই কখন যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিলেন বুঝতেই পারেননি। এখন চোখ খুলে দেখলেন মনুয়া তাকে ডাকবার জন্যে ছাদে উঠে এসেছে।

লজ্জিতমুখে ঘোষাল সাহেব হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। বেশি বাজেনি। সবে সাড়ে আটটা। তবে মনুয়ার কথা মতন ডিনারটা সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যায়। তাহলে কাল ভোর ভোর উঠে পুরো দুর্গটা দেখে নেওয়া যাবে। ওই বুড়ো যা সব বলে গেল—দুরকমের সিঁড়ি, দরজার ধারালো গুল, মাটির নিচের ঘর—ওগুলো সব মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। হোটেলটাকে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার সময় ওগুলোকে রক্ষা করা খুব জরুরি। ওগুলোর সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে — বিশ্বাসঘাতকতার রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

ঘোষালসাহেব মনুয়ার পেছন পেছন দুর্গাধিপতির প্রাসাদের একতলায় এক বিশাল হলঘরে পৌঁছলেন। পাথরের দেয়াল। ছাদের কড়িবরগাগুলো বহু বছরের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। সেই কড়িবরগা থেকেই শেকলে বাঁধা দুটো বিরাট বাতিদান ঝুলছে। মনুয়া

বাতিদানে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে। তার আলোয় দেয়ালে টাঙানো অস্ত্রশস্ত্রগুলো মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে। প্রণব ঘোষাল এমন পরিবেশ শুধু সিনেমার পর্দাতেই এতদিন দেখেছেন। আজ বাস্তবে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছিয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আবারও মনে মনে ভাবলেন, লাক্সারি জিনিসটা পয়সা দিয়ে যখন তখন কেনা যায়, কিন্তু আভিজাত্য অর্জন করতে হয়। আড়াইশো বছর ধরে বিরামগড় দুর্গের এই ডিনার—হল সেই আভিজাত্য অর্জন করেছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে শাল কাঠের বিরাট ডিনার—টেবিল। পালিশ করা নয়, করাত দিয়ে চিরে গাছের গুঁড়িগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় একদিন এই টেবিলে বসে যারা খানাপিনা সারত তারা ছিল রোদে পোড়া, জলে ভেজা রুক্ষ সব মানুষ। তারা ছিল ঘোড়ার পিঠে মাইলের পর মাইল ছুটে চলা যোদ্ধা।

ঘর আর টেবিলের সঙ্গে মানানসই বাসনকোসন। তাদের মধ্যে চিনে ক্রকারির রংচং নেই। মোরাদাবাদি পেতলের সূক্ষ্ম কারুকাজও না। সাদামাটা ভারী ভারী কাঁসা পেতলের বাটি গ্লাস। পাথরের থালা।

ঘোষালসাহেবকে টেবিলের এক প্রান্তে বসিয়ে মনুয়া উঠোনের অন্যদিকে রান্নাঘরে খাবার আনতে চলে গেল। সে যখন চলে যাচ্ছে তখন ঘোষালসাহেব তাকে পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপ্তে সাহেব কোথায়, মনুয়া? তিনি খাবেন না?

নেহি হুজৌর। উনকি তবিয়ত ঠিক নেই হ্যায়। মনুয়া জানাল দুপুরবেলায় রোদে ঘুরে আপ্তে সাহেবের না কি ভয়ঙ্কর শরদর্দ হয়েছে। তাই না খেয়েই শুতে চলে গেছেন।

মনুয়া রান্নাঘরে চলে গেল। ঘোষাল সাহেব মন দিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা একটা বর্ম দেখছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন আগেকার দিনের সমস্ত মানুষের শরীরই কি ওই বর্মটার মতন দৈত্যাকার ছিল? হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে দেখলেন সেই বুড়ো মাধবরাও। তাকে দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল ঘোষাল সাহেবের। বললেন কী ব্যাপার মাধবরাও?

মাধবরাও চাপা স্বরে বলল, মনুয়ার মতন চ্যাঙড়ারা কী জানে, কেমন করে মেহমানের খাতিরদারি করতে হয়? থালা লাগিয়েছে দেখুন। এখানে একটা, ওখানে একটা। হুজৌর কি নিজের হাতে এসব সাজাবেন? লজ্জা লজ্জা।

বলতে বলতে মাধবরাও অভ্যস্ত হাতে চটপট থালা বাটিগুলোকে ঘোষালসাহেবের সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। দুয়েকটা নতুন বাসনও কোথা থেকে যেন নিয়ে এল। তারপর মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে গেল।

মনুয়া কাঁসার থালায় গরম ধোঁয়া ওঠা পোলাও বেড়ে দিল। তারপর পাশের পাথরের বাটিতে ঢেলে দিল চিকেন উইথ মাশরুম।

তারপর মনুয়া আর ঘোষালসাহেব দুজনেই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সেই পাথরের বাটির দিকে। বাধ্য হলেন তাকিয়ে থাকতে। কারণ তখন সাদা পাথর রং বদলাচ্ছে। আকাশি থেকে হালকা নীল, তারপর দেখতে দেখতে থ্যাঁতলানো নখের মতন কালচে নীল হয়ে গেল সেই পাথরবাটি।

মনুয়া নিশ্চয় দুর্গের বাসিন্দাদের মুখে বংশপরম্পরায় চলে আসা গল্পটা জানত। সেইজন্যেই প্রণব ঘোষাল কিছু বলার আগেই মনুয়া নিজেই অস্ফুট স্বরে দুবার বলে উঠল—বিষপাথর! বিষপাথর! তারপরেই সে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের ওপর বসে পড়ল। প্রণব ঘোষাল যখন টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে তার হাতটা ধরে ওঠালেন তখন সে কেবল বিড় বিড় করে বলছে মাফ কর দো, মুঝে মাফ কর দো সাহাব। গলতি হো গয়া মুঝসে। প্যাসা কে লালচ মে বহোত বড়া গলতি কর দিয়া ম্যায়নে।

চার

দুর্গাধিপতি যশোরাজ কেলকারের বর্তমান বংশধর জীবনদেব কেলকার পরদিন ভোর না হতেই সঙ্গে পুলিশ নিয়ে বিরামগড় দুর্গে এসে উপস্থিত হলেন। কারণ, রাতেই তাকে ঘোষালসাহেব টেলিফোনে সব কথা জানিয়েছিলেন। বিরামগড়ের অন্য কর্মীরা প্রণব ঘোষালের মুখ থেকে সব শুনে সুধাকর আপ্তে আর মনুয়াকে সারা রাত একটা ঘরে আটকে রেখে দিয়েছিল। পুলিশের সামনে ফেরারি গ্রুপের চীফ অ্যাকাউন্টান্ট সুধাকর আপ্তে স্বীকার করল যে, কোম্পানির প্রচুর পয়সা সে ইতিমধ্যেই চুরি করেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে না পারলে সেই চুরি সে আর বেশিদিন ঢেকে রাখতে পারত না। অথচ প্রণব ঘোষাল বেঁচে থাকতে তার পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পোস্টটা পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব সে ঠিক করেছিল বিষাক্ত মাশরুম খাইয়ে প্রণব ঘোষালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

আপ্তের প্ল্যানটা প্রায় নিখুঁতই ছিল। রান্না করে খাওয়ার মতন নিরাপদ মাশরুম আর প্রাণঘাতী বিষাক্ত মাশরুম এখানকার জঙ্গলে পাশাপাশিই গজিয়ে ওঠে। তাদের চেহারাও প্রায় একইরকম। খুব অভিজ্ঞ লোক ছাড়া অন্য কেউ তাদের আলাদা করতে পারে না। তাই প্রতি বছরই দুয়েকজন ভুল করে বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মারা যায়।

মনুয়া অবশ্য খুব ভালো করেই তফাতটা জানত এবং আজ সে বেছে বেছে বিষাক্ত মাশরুমই নিয়ে এসেছিল। তবে প্রণব ঘোষাল মারা গেলে সে তো আর সে কথা স্বীকার করত না। কাজেই প্রণব ঘোষালের মৃত্যুটা মনুয়ার অনিচ্ছাকৃত ভুল বলেই চালিয়ে দেওয়া যেত।

সবই ঠিকঠাক হত, শুধু যদি মাশরুমের তরকারিটা বিষপাথরের বাটিতে না পড়ত।

মনুয়া আর সুধাকর আপ্তেকে নিয়ে পুলিশের জিপ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও জীবনদেব কেলকার বারবার নিজের মনেই মাথা নাড়ছিলেন আর বলছিলেন, অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য! আমরা ছোটবেলা থেকে যে জিনিসের গল্প শুনে আসছি, সে জিনিস যে আমাদের রান্নাঘরের বাসনপত্রের মধ্যেই মিশে রয়েছে তা জানব কী করে? ঘোষালসাহেব,

ধন্য বাঙালি নলেজ। আপনি দেখিয়ে না দিলে কোনোদিন পূর্বপুরুষের এই অমূল্য সম্পদ হাতে পেতাম?

প্রণব ঘোষাল দুয়েকবার বলতে গিয়েছিলেন, তিনি মোটেই ওই বিষপাথরের বাটি খুঁজে বার করেননি, করেছে মাধবরাও বলে এক বুড়ো। তার জন্যেই তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই জীবনদেব কেলকার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, ওই নামে কেউ এখানে নেই মিস্টার ঘোষাল। আমার চাকরিতে ওই নামে কেউ থাকতে পারে না, তা সে যত গুণী লোকই হোক। কারণ যে বিশ্বাসঘাতকটার জন্যে আমার পূর্বপুরুষ যশোরাজ মারা গিয়েছিলেন তার নাম ছিল মাধবরাও। মাধবরাও শিরোদকার।

চলে গেছি তবু আছি



এক

এর আগে শিবুদার লেখাটা ওঁনারই বাড়ির বাইরের ঘরে বসে একবার উলটে পালটে

দেখেছিলাম। ভালো করে পড়া হয়নি। তাই এখন আবার সেটা পড়তে শুরু করলাম।

শিবুদা ছিলেন একলা মানুষ। একটা মাধ্যমিক স্কুলের সায়েন্স—টিচার। বয়স বছর সাতান্ন আটান্ন হবে। বেঁটেখাটো, মাথায় হালকা টাক, পরিষ্কার কামানো গাল আর শুঁয়োপোকার মতন মোটা একজোড়া ভুরু। পুরুলিয়া শহরের হুচুকপাড়ায় একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওঁনার মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আমি কলকাতা থেকে দৌড়ে এসেছিলাম আর বাঁকুড়া থেকে এসেছিলেন ওঁনার

এক ভাই। তিনিই আমার হাতে কয়েকটা কাগজ তুলে দিয়ে বললেন, দেখুন তো অনীকবাবু! এগুলো খাটের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। শুরুতেই আপনার নাম দেখে মনে হচ্ছে দাদা আপনার পত্রিকার জন্যেই কিছু লিখছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, খাটের ওপর ছড়ানো ছিল মানে? এই বাড়ির খাটে? তাতে শিবুদার সেই ভাই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বললেন, না না। এখানে কেন? আপনাদের ওই ভূতুড়ে বাড়িতে। যে ঘরে দাদা মারা যান সেই ঘরেই একটা চৌকির ওপর এগুলো পড়েছিল। দেখুন, পড়ে দেখুন। হয়তো বুঝতে পারবেন আপনাদের পত্রিকার পাগলামোর ঠেলায় একজন মানুষ কেমন করে বেঘোরে প্রাণ—টা দিল।

পত্রিকার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের যে একটু পাগলামো আছে এটা অনেকেই বলে থাকেন। ঠিক চেনা পথে ওটাকে চালাই না তো, তাই।

পত্রিকার নাম 'নিশিডাক'। ত্রৈমাসিক রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকা, দাম কুড়ি টাকা। নিশিডাক গত অগাস্টে সবে তিন —বছরে পা দিল, তবে এর মধ্যেই খুব পপুলার হয়ে উঠেছে। সম্পাদক হিসেবে আমি এবং শিবুদার মতন পত্রিকার ওয়েল—উইশাররা সারাক্ষণ কেমন করে পত্রিকাটাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার জন্যে নানারকমের প্ল্যান খাটাই। ভালো শিল্পীদের দিয়ে ছবি আঁকাই। নতুন নতুন ফিচার যোগ করি। গত সংখ্যা

থেকেই যেমন একটা নতুন ফিচার শুরু করেছি। নাম 'চলে গেছি তবু আছি'। বিষয় ভূতুড়ে বাড়ি।

কলকাতার ভূতুড়ে বাড়ির ইতিহাস নিয়ে আগে অনেক লেখালেখি হয়ে গেছে। তাই ঠিক করেছিলাম গার্স্টিন—প্লেসের পুরনো রেডিও—অফিস, ব্যারাকপুরের সাহেব—কুঠি কিংবা রাইটার্স বিল্ডিং—এর ভূতের কথা আর লিখব না। বরং গ্রাম কিংবা মফসসলের অল্প জানা সব ভূতুড়ে বাড়িতে আমাদের লেখকরা এক একটা রাত কাটিয়ে তাদের সেই হাতে—গরম অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন।

আগের সংখ্যায় পালসিটের এক পুরনো জমিদারবাড়িতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন আমাদের সহ—সম্পাদক তরুণ ব্যানার্জি। লেখাটা নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। কাল অবধি পাঠকদের কাছ থেকে প্রশংসা জানিয়ে চুয়াল্লিশটা চিঠি এসেছে। তবুও শিবুদার ভাইয়ের মতন লোকজন যদি এটাকে পাগলামি ভাবেন, তাহলে ভাবতেই পারেন।

আগামী সংখ্যার জন্যে যখন ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি তখনই পুরুলিয়া থেকে শিবেন্দু অধিকারী, মানে আমাদের শিবুদা ফোন করে বললেন, অনীক, আমাদের এদিকে একটা ভূতের বাড়ি আছে বলে শুনলাম। কভার করব?

আমি বললাম, আরে, পারমিশন নেওয়ার কী আছে শিবুদা? করে ফেলুন।

আমার আগ্রহের কারণ ছিল। শিবুদা নিজে রহস্য—কাহিনির পোকা। দেশ বিদেশের মিস্ট্রি আর হরর স্টোরি গুলে খেয়েছেন। উঁচুমানের সাহিত্য বলে ওগুলো পড়তে

ভালোবাসেন কিন্তু নিজে মোটেই ভূতে বিশ্বাস করেন না। ভয়ঙ্কর ডাকাবুকো লোক। নিশিডাক পত্রিকার প্রথম ছটা সংখ্যায় ডাকিনী আর তান্ত্রিকদের নিয়ে ওঁনার লেখা একটা দারুণ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। সেই লেখাটার মেটিরিয়াল জোগাড় করার জন্যে শিবুদা বীরভূমের শ্মশানে—মশানে যেভাবে রাতের পর রাত প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেরিয়েছিলেন, তাই নিয়েই আলাদা একটা গল্প লেখা যায়।

মুশকিল একটাই। নিজে ভালো পাঠক হলেও শিবুদার ভাষাটা তত জোরালো নয়। কীভাবে একটা ছোট জিনিসকে বেশ খেলিয়ে বড় করে লেখা যায়, সেটা বুঝতে পারেন না। তাই উনি আমাকে লেখার কাঁচামালটুকু ধরিয়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলেন। সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বড় করে আমি পত্রিকায় ছাপাই।

এবারেও সেইরকমই কথা হয়েছিল। শিবুদার আবার কম্পিউটারে অ্যালার্জি। বলেছিলেন প্রত্যেকবার যেমন করেন, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আমাকে স্পিড—পোস্টে পাঠিয়ে দেবেন। পাঠাতে পারেননি অবশ্য। ওঁনার ভাইয়ের হাত ঘুরে লেখাটা আমার কাছে এল।

শিবুদার শেষযাত্রা থেকে ফিরে কলকাতার ট্রেন ধরতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই ধরলাম না। বরং লোকজনকে জিজ্ঞেস করে চলে গেলাম শিবযজ্ঞ রোডের সেই ভূতুড়ে বাড়িটায় যেখানে রাত কাটাতে গিয়ে শিবুদা প্রাণ হারিয়েছেন। শিবুদার কাছেই শুনেছিলাম পাশের প্রাইমারি স্কুলের কেয়ারটেকারের কাছে ওই বাড়ির চাবি থাকে।

তাকে গিয়ে বললাম, রাতটা ওখানে থাকতে চাই। শুনে তো ভদ্রলোকের ভিরমি খাওয়ার দশা। বললেন, মশাই, সবাই জানে ভূতের বাড়ি। গোঁয়ার্তুমি করে ওখানে থাকতে গিয়ে অধিকারীমাস্টার সদ্য সদ্য প্রাণটা খোয়ালেন, আর তারপরেও আপনি বলছেন ওই বাড়িতে ঢুকবেন!

আমি বললাম, আহা! অধিকারীবাবুর মারা যাওয়ার ব্যাপারটা তো অ্যাকসিডেন্ট। ডাক্তার তো তাই বলেছে। এর মধ্যে ভূতকে টানছেন কেন? তারপর ঝোলা থেকে নিশিডাকের পুরনো কটা কপি বার করে ভদ্রলোকের হাতে গুঁজে দিলাম। প্রত্যেকটার মলাটে মড়ার খুলি, কালো বাদুড়, হানাবাড়ি, প্ল্যানচেটের টেবিল—এইসব রোমহর্ষক ছবি। বললাম, আমি এই পত্রিকার সম্পাদক।

ভদ্রলোক মলাটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কী বুঝলেন কে জানে। প্যান্টের পকেট থেকে চাবিটা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা ভালো বোঝেন করুন। কিছু হয়ে গেলে আমাকে দোষ দেবেন না।

সেটা সন্ধেবেলার ঘটনা। এখন রাত হয়েছে। বাস—স্ট্যান্ডের কাছে একটা ধাবা থেকে রাতের খাওয়া সেরে এসে ওই বাড়িরই একটা ঘরে জমিয়ে বসেছি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই ঘরেই শিবুদার সঙ্গে মৃত্যুদেবতার মোলাকাত হয়েছিল।

ঘরটায় একটা চৌকি ছিল। ভালো করে গায়ে হাতে—পায়ে মশা তাড়ানোর ক্রিম মেখে সেটার ওপর পা ছড়িয়ে

আরাম করে বসলাম। তারপর ঝোলা থেকে শিবুদার সেই লেখাটা বার করে লণ্ঠনের আলোয় পড়তে শুরু করলাম।

দুই

শিবুদা বরবারই 'কথা কম, কাজ বেশি' টাইপের মানুষ। এই লেখার মধ্যেও ওঁনার সেই কেজো নেচার—টা স্পষ্ট। কোনো ভ্যানতাড়া না করেই শুরু করেছেন :

অনীক, বাড়িটার মধ্যে অনেক গা ছমছমে ব্যাপার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেগুলোকে ভৌতিক বলা যায় না। অস্বীকার করব না, কাল সারা রাত ভালো করে ঘুমোইনি। অনেকবার আঁতকে উঠেছি। হঠাৎ কোনো আওয়াজ শুনে, কিংবা অদ্ভুত কিছু একটা দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও ঠিক, প্রত্যেকবারই আঁতকে ওঠার মতন ঘটনাগুলোর পেছনে একটা করে নিতান্ত লৌকিক কারণও খুঁজে বার করেছি— ওই মাথায় ঘোমটা—টানা পেত্নীকে কলাগাছের ছায়া বলে চিনতে পারার মতন আর কী।

পড়তে পড়তেই ভাবলাম, বেশি রাত হওয়ার আগে বাড়িতে একটা ফোন করে নিলে হয়। কটা বাজল?

জানি, চলছে না। তবু দেয়ালের পুরনো আমলের পেন্ডুলাম ক্লকটার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল। ওটা বারোটা বেজে পাঁচ—মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঘরে প্রথমবার যখন পা দিলাম তখনই ঘড়িটা আমার চোখ টেনেছিল। চারিদিকে আর সবকিছুই যখন এক ইঞ্চি ধুলোর চাদরে মোড়া, তখন ওই ঘড়িটা কিন্তু বেশ সাফ সুতরো রয়েছে। নিশ্চয় শিবুদা ওটাকে পরিষ্কার করে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। চললে ভালোই হত। বারবার পকেট থেকে সেল—ফোন বার করে সময় দেখতে হত না।

দেয়ালঘড়ি বন্ধ, তাই সেল—ফোনেই সময় দেখলাম — সাড়ে এগারোটা। বাড়িতে ফোন করার পক্ষে রাতটা বেশিই হয়ে গেছে। একবার জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালাম। কাচের সার্সি দেওয়া জানলা। পর্দা নেই। ঘরের ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছে বাইরে জ্যোৎস্না ফট—ফট করছে। সেই জোরালো জ্যোৎস্নার সামনে এই পৃথিবীর সবকিছুরই রং কাজলের মতন কালো— ইটের পাঁচিল, পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বেড়াল, সুপুরিগাছের কঙ্কালসার শরীর— সব।

আবার লেখার দিকে চোখ ফেরালাম। শিবুদা লিখেছে, তোমাকে যদি বলা হয় একটা বাড়ির বাগানের জামরুলগাছের ডালে দড়ি ঝুলিয়ে চার—বছর আগে একটা মেয়ে সুইসাইড করেছিল, তাহলে সেই বাড়িটার সম্বন্ধে তোমার মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয় ঢুকে যাবে। ওই ভয় থেকেই তুমি তখন প্রত্যেকটা গাছের ছায়ায় ভূত দেখবে। বেড়ালের ডাক শুনে মনে হবে মানুষের কান্না।

ঠিক এই সময়েই বাগানের দিক থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল। মনে হল একটা কমবয়েসি মেয়ে কাঁদছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। তারপরেই নিজের মনে হেসে উঠলাম। মেয়ে নয়। মেয়ে কোত্থেকে আসবে? ওই বেড়ালটাই হবে নিশ্চয়, যেটা একটু আগে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়েছিল। শিবুদার কথার মোক্ষম প্রমাণ দেওয়ার জন্যেই যেন বেটা ঠিক এইসময়ে কেঁদে উঠল।

কান্নাটা যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ করে থেমে গেল। আমি আবার শিবুদার লেখাটার দিকে মন দিলাম।

বুঝলে অনীক, রাত বারোটার সময় টপ—টপ করে একটা আওয়াজ শুরু হল। নিস্তব্ধ বাড়িতে শব্দটাকে এত বিকট লাগছিল কী বলব। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে শেষ অবধি ধুত্তোর বলে উঠে পড়লাম। বাড়িটায় ইলেক্ট্রিকের কানেকশন নেই। আমি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে শুয়েছিলাম। সেটা হাতে নিয়েই বাথরুমে ঢুকলাম।

বাথরুমের ভেজানো দরজাটা ঠেলে খোলা মাত্র আমার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল। আমার মুখোমুখি একটা মুখ। অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। লণ্ঠনটা একটু তুলে ধরতেই ওদিকের লোকটাও একটা লণ্ঠন তুলে ধরল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। দেয়ালের আয়নাটার কথা মনে ছিল না।

লৌকিক কারণ নাম্বার ওয়ান।

এবার সেই শব্দের উৎস খুঁজতে হয়। তাও পেয়ে গেলাম। দেয়ালে লাগানো কলের মুখ থেকে কী জানি কেন এই রাত বারোটার সময় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। হতেই পারে। আজ চারবছর বাদে এই কলটা খোলা হয়েছে। আমিই খুলেছিলাম। তখনই ওয়াশার—টোয়াশার কিছু একটা আলগা হয়ে গেছে নিশ্চয়। স্টপ—ককটাকে অনেকভাবে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। টপ টপ করে জল পড়েই যেতে লাগল। হতাশ হয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। চেষ্টা করলাম, শব্দটা থেকে মনটা সরিয়ে আনতে। সে তো পারলামই না, উলটে অন্য একটা শব্দ বড় বীভৎসভাবে

কানে ধাক্কা মারতে শুরু করল। এটা 'টপ—টপ' নয়; 'টিক—টিক'।

আবার বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘড়িটাকে দেয়াল থেকে নামিয়ে সামনের খুপরিটার মধ্যে হাত গলিয়ে পেন্ডুলামটাকে ধরে একটা টান দিলাম। কট করে একটা আওয়াজ হল। তারপরেই পেন্ডুলামের দুলুনি বন্ধ। নিশ্চিন্ত। ঘড়িটাকে আবার দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম।

আমি মনে মনে বললাম, ও! এইজন্যেই ঘড়িবাবাজি নট নড়ন চড়ন। শিবুদা ঠিক বারোটা পাঁচ মিনিটে ওটার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন।

কিন্তু বাথরুমের কল থেকে এখন তো আর জল পড়ছে না। বন্ধ হল কেমন করে? শিবুদা তো লিখেছেন ও ব্যাপারে কিছু করে উঠতে পারেননি। হয়তো এরই মধ্যে মরচে জমে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

সারাদিনের নানান ধকলে কখন যে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল নিজেই জানি না। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। টপ—টপ—টপ—টপ ক্রমাগত হয়েই চলেছে শব্দটা। বুঝতে পারছি ওটা কীসের শব্দ। কলটা থেকে আবার কোনো কারণে জল লিক করতে শুরু করেছে। ওটা বন্ধ করতে হবে, নাহলে ঘুমোতে পারব না। মাথার কাছে লণ্ঠনটা নিবু নিবু হয়ে এসেছিল। সেটার দম বাড়িয়ে বাথরুমের দিকে এগোলাম।

দরজা খুলতেই দেখলাম উল্টোদিকে একটা মুখ। না, ভয় পাওয়ার প্রশ্ন নেই। আমি তো শিবুদার লেখা পড়েছি। ওই দেয়াল আয়নাটার জন্যে আমি তো মনে মনে তৈরিই

ছিলাম। ওটার দিকে আর না তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্টপ—ককটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কিছুই করতে পারলাম না, আবার ঘরে ফিরে এলাম।

ভয় পাওয়ার কথা নয়, তবুও একটু একটু ভয় করছিল। আয়নার মধ্যে থেকে যে মুখটা আমার দিকে তাকিয়েছিল, সেটা কি আমারই মুখ? একটুক্ষণই দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন ছায়ার মানুষটার সামনের চুল পাতলা। ভুরু দুটো মোটা। সবচেয়ে বড় কথা, আমার চোখে চশমা ছিল, ছায়াটার চোখে ছিল না। শিবুদাও চশমা পড়তেন না। আমার থেকে শিবুদার সঙ্গেই যেন বেশি মিল ছিল ছায়াটার। মনের ভুল? তাই হবে।

জানি চলছে না। তবু পাপোশে পা মুছে চৌকিতে উঠবার আগে আরেকবার দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকালাম।

না, এটার জন্যে তৈরি ছিলাম না। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বরফের স্রোত নেমে গেল। ঘড়িটা চলতে শুরু করেছে! মিনিটের কাঁটা টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে! সময় দেখাচ্ছে বারোটা বেজে সাত মিনিট। সেলফোনের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম— ঠিকই দেখাচ্ছে। কিন্তু ভাঙা পেন্ডুলাম নিয়ে কেমন করে ঘড়িটা চলল? এরও কি কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা রয়েছে?

তিন

না, আর ঘুমোব না। বরং বসে বসে শিবুদার লেখার বাকিটুকু পড়ে শেষ করি। যে অবধি পড়েছিলাম, তারপর থেকে আবার পড়তে শুরু করলাম। শিবুদা লিখেছেন :

ভূতুড়ে বাড়িতে এসেছি ভৌতিক কাণ্ডের খোঁজে। মনে মনে জানি কিছুই পাব না, কিন্তু এই যে গা—ছমছমানি— এটাই বা কম কী? আজকের আবহাওয়াটাও অদ্ভুত। আকাশ পরিষ্কার, বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। কিন্তু তার সঙ্গে একটা জোরালো হাওয়াও বইতে শুরু করেছে। জানলাগুলো বন্ধ থাকায় হাওয়ার আওয়াজ ঘরের মধ্যে পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু সুপুরি গাছের দাপাদাপি দিব্যি টের পাচ্ছি।

এতক্ষণ একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছিল। হঠাৎ সেই ডাকটা বন্ধ হয়ে গেল। এরকম অবস্থায় সবার যা হয় আমারও তাই হল। পুরো মনোযোগটা এসে জড়ো হল দুটো কানে। তখন হয়তো আমি সত্যিকারের সুচ পড়ার শব্দও শুনতে পেতাম। কিন্তু যেটা শুনলাম সেটা সুচের শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো— চুড়ির আওয়াজ। এই ঘর থেকে বেরিয়েই একটা করিডর রয়েছে, যার একদিকে বাথরুম, অন্যদিকে একটা সরু দরজা। খিড়কি দরজা বললে বোধহয় ঠিক হয়। সেটা খোলে বাগানের দিকে। চুড়ির শব্দটা এল ওই দরজাটার কাছ থেকেই। কিন্তু সেই দরজাটায় তো আমি নিজের হাতে খিল লাগিয়েছি।

এবার আর শুধু লণ্ঠন নয়, ব্যাগের ভেতর থেকে আমার গুপ্তিটাও বার করে হাতে নিলাম। তারপর একলাফে বিছানা থেকে নেমে বেরিয়ে গেলাম করিডরে। না, অলৌকিক কিছু নয়। তুমি যতই 'নিশিডাক' পত্রিকার সম্পাদক হও, মনে মনে তুমি নিজেই জানো অলৌকিক বলে কিছু নেই। তাই চুড়ির শব্দ খুঁজতে গিয়ে আবারও পৌঁছে গেলাম ভীষণরকম লৌকিকে। একজন কাঠের মিস্তিরিকে লাগিয়েছিলাম খিল আর ছিটকিনিগুলো ঠিক করে দেওয়ার জন্যে। লোকটা ওখানে ওই দরজাটার সামনে বসে কাজ করেছিল। যাওয়ার সময় এক কৌটো কাঁটাপেরেক ফেলে গেছে। আমি আলো নিয়ে বেরোনোমাত্র দুটো ধাড়ি ইঁদুর সেই

পেরেকের কৌটো থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে দৌড় লাগাল। আবার শব্দ উঠল রিন রিন রিন। আমি একা একা হেসে উঠলাম।

এইখানে আমাকে পড়া থামিয়ে দিতে হল। কারণ, পরিষ্কার শুনলাম, বাইরে করিডরে চুড়ির শব্দ হল। ঠিক এরকম একটা শব্দই কি শিবুদা শুনেছিলেন? আমি কি বাইরে বেরিয়ে দেখব কীসের শব্দ? কী দরকার? শিবুদা তো বলেই দিয়েছেন এ বাড়িতে ইঁদুর রয়েছে। কাঁটাপেরেক না হোক, অন্য কিছু নিয়ে সেগুলো নিশ্চয় টানাটানি করছে আর তাতেই ওই রিনরিনে আওয়াজ হচ্ছে।

না, একবার যাই।

গেলাম এবং ফিরে এলাম। কিছু দেখতে পেলাম না। শব্দটা করিডর ধরে চলে গেল বাড়ির সামনের দিকে। ইঁদুর নয়। অন্য কিছু।

শিবুদা লিখেছেন— আকাশ পরিষ্কার, তবু বাইরে বাগানে হাওয়ার তাণ্ডব চলছে। ঘুম আসছে না। মন বলছিল, যদি কিছু হয় ওই জানলাটার কাছেই হবে। কিন্তু কী হবে অনীক? এমন কী হতে পারে, বিজ্ঞান দিয়ে যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না?

জানি, সবই জানি। কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার এই শিবযজ্ঞ রোডের বাড়িতে বসে মনে হচ্ছে চারবছর আগে অনেক যন্ত্রণা নিয়ে যে মেয়েটা মরে গিয়েছিল, তার সেই যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই কি কোথাও থাকবে না?

ওই তো। ওই তো সে এসেছে। জানলার বাইরে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু কোমর থেকে গলা আর দুটো হাত। মাথাটা কি বুকের ওপর ঝুঁকে আছে? তাই দেখতে পাচ্ছি না? দাঁড়াও অনীক। আমি একবার জানলা

খুলে দেখে আসি ব্যাপারটা কী? হয়তো ও সেই মেয়েটা নয়। হয়তো এর পেছনেও একটা নিতান্ত সাদমাটা ইঁদুর—বাদুড়ের মতন কোনো কারণ খুঁজে পাব। একটু বাদে সেটা লিখছি। দাঁড়াও।

না, আর কিছু লিখতে পারেননি শিবুদা। শিবুদার শরীরটা ওই জানলার কাছেই মেঝের ওপর পড়ে ছিল। এর পেছনেও একটা নিতান্ত লৌকিক কারণ ছিল। সেটা শিবুদা জেনে যেতে পারেননি, কিন্তু আমি জানি। এই বাড়িতে ঢোকার আগে যখন চারিদিকটা ঘুরে দেখে নিচ্ছিলাম, তখনই আবিষ্কার করেছিলাম— বাগানের তারে মেলে দেওয়া শিবুদার একটা ফুলহাতা টি—শার্ট হাওয়ায় উড়ে এসে জানলার কাচে লেপটেছিল। এখন বুঝতে পারছি, ঘরের ভেতর থেকে সেটাকে দেখেই শিবুদা ভেবেছিলেন...।

শিবুদা দুহাতে জানলার পাল্লার লোহার ফ্রেম দুটো ঠেলে সরিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হাওয়ার একটা প্রচণ্ড ঝটকায় একটা লোহার ফ্রেম ওঁনার ডানহাতের আঙুলের ওপর আছড়ে পড়ে। হাতের তালু থেকে তিনটে আঙুল সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ে যায়। জানলার ফ্রেমে শুকনো রক্তের দাগ ছিল।

শিবুদার পোস্টমর্টেম করেছেন যে ডাক্তারবাবু তাঁর সঙ্গে আমি আজ সকালেই কথা বলেছি। ওঁনার বক্তব্য— এই শক—টাতেই শিবুদার হার্ট—অ্যাটাক হয়। উনি মারা যান।

শিবুদার লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। শূন্য চোখে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎই লণ্ঠনটা

দপদপ করতে করতে নিভে গেল। একইসঙ্গে থেমে গেল বাথরুমের কল থেকে জল পড়ার টপ—টপ শব্দটা।

শিবুদা অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বিশ্বাসকে সম্মান জানাবার জন্যেই আমি কোনোরকমে চৌকি থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। কলের জলের এই যে স্বেচ্ছাচার— এই যখন ইচ্ছে টুপিয়ে পড়া, যখন ইচ্ছে বন্ধ হওয়া— এর একটা সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে বার করা যাবে নিশ্চয়।

তবে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম তার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে কি না আমার জানা নেই।

একটা আঙুল— একটা রক্তাক্ত কাটা আঙুল স্টপককের মুখে ঢুকে জলের ফোঁটাগুলোকে আটকে রেখেছে।

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ততক্ষণে ঘড়ির শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। এরকমটাই আশা করছিলাম। আরও দুটো কাটা আঙুল পেন্ডুলামটাকে প্রাণপণে চেপে ধরে রেখেছে।

তাহলে তো আর একটা জিনিসই বাকি থাকে। আমি জানলার দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। সার্সির ওপাশে যা ভেসে আছে তা কোনো উড়ে আসা টি—শার্ট নয়।

শিবুদার মুখ।

খেলাঘর



এক

নির্মাল্য বসু নিজে একজন নামজাদা ইন্টিরিয়র—ডেকরেটর। কাজেই তিনি যখন নিজের জন্যে বাড়ি বানালেন, তখন সেই বাড়িকে যে তিনি নিজের হাতে সাজাবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

মনের মতন করে বাড়িটাকে সাজানোর ব্যাপারে কোথাও কোনো কার্পণ্য করেননি নির্মাল্যবাবু। না পয়সার, না পরিশ্রমের। যেখানে যে জিনিসটা মানাবে বলে মনে হয়েছে, সেই জিনিসটাকেই যে কোনো মূল্যে জোগাড় করে এনেছেন তিনি।

তবে শুধু পয়সা বা পরিশ্রম দিয়েই তো আর সৌন্দর্য রচনা করা যায় না। তার জন্যে আরও কয়েকটা জিনিস লাগে—যেমন রুচি, কল্পনা, জ্ঞান। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে না; নির্মাল্যবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ালেই যে কেউ বুঝতে পারবে, এই বাড়ির মালিকের মধ্যে ওই তিনটি জিনিসই বিস্তর পরিমাণে রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক বাড়ির উত্তরদিকের গ্রানাইট পাথরের দেয়ালটার কথা। প্রথম যখন তৈরি হল তখন নির্মাল্যবাবুর বন্ধুস্বজনরা অনেকেই বলেছিলেন, এটা কী করলে নির্মাল্য? বিবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, এরকম দেয়াল ভালো লাগে না কি?

আজ যখন সেই রুক্ষ গ্রানাইটের ওপর একটা আইভিলতার ঝাড় লতিয়ে উঠেছে, আর পাথরের গা বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে জলের ধারা, তখন তারাই আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না।

বাড়ির ভেতরে বাইরে এরকম বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সব কিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে—সেটা হল একটা প্রাচীনতার ছাপ, ইংরিজিতে যাকে বলে 'অ্যান্টিক—লুক'। ইচ্ছে করেই নিজের নতুন বাড়িতে এই প্রাচীনতার ছাপটা নিয়ে এসেছেন নির্মাল্যবাবু। সেইজন্যেই তাঁর বাড়ির সদর দরজায় রাজস্থানি পেতলের সূক্ষ্ম কারুকাজ। আলোর আধুনিক শেডের বদলে ব্রিটিশ আমলের গ্যাস ল্যাম্পের ঢাকনা। সিঁড়ির চাতালে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। এমনকি ড্রইং—রুমের ফার্নিচারগুলোও সাহেবি আমলের।

তবে শুধু পয়সা বা পরিশ্রম দিয়েই তো আর সৌন্দর্য রচনা করা যায় না। তার জন্যে আরও কয়েকটা জিনিস লাগে—যেমন রুচি, কল্পনা, জ্ঞান। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে না; নির্মাল্যবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ালেই যে কেউ বুঝতে পারবে, এই বাড়ির মালিকের মধ্যে ওই তিনটি জিনিসই বিস্তর পরিমাণে রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক বাড়ির উত্তরদিকের গ্রানাইট পাথরের দেয়ালটার কথা। প্রথম যখন তৈরি হল তখন নির্মাল্যবাবুর বন্ধুস্বজনরা অনেকেই বলেছিলেন, এটা কী করলে নির্মাল্য? বিবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, এরকম দেয়াল ভালো লাগে না কি?

আজ যখন সেই রুক্ষ গ্রানাইটের ওপর একটা আইভিলতার ঝাড় লতিয়ে উঠেছে, আর পাথরের গা বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে জলের ধারা, তখন তারাই আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না।

বাড়ির ভেতরে বাইরে এরকম বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সব কিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে—সেটা হল একটা প্রাচীনতার ছাপ, ইংরিজিতে যাকে বলে 'অ্যান্টিক—লুক'। ইচ্ছে করেই নিজের নতুন বাড়িতে এই প্রাচীনতার ছাপটা নিয়ে এসেছেন নির্মাল্যবাবু। সেইজন্যেই তাঁর বাড়ির সদর দরজায় রাজস্থানি পেতলের সূক্ষ্ম কারুকাজ। আলোর আধুনিক শেডের বদলে ব্রিটিশ আমলের গ্যাস ল্যাম্পের ঢাকনা। সিঁড়ির চাতালে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। এমনকি ড্রইং—রুমের ফার্নিচারগুলোও সাহেবি আমলের।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যা দাঁড়াল, তাতে নির্মাল্যবাবু, তার স্ত্রী মৌটুসি আর তাদের ছোট্ট মেয়ে রুম্পা—তিনজনেই তাদের নতুন বাড়ি নিয়ে খুব খুশি। শুধু বহুদিনের পুরনো কাজের লোক বিজনবিহারী, যাকে নির্মাল্যবাবু আর তার স্ত্রী বিজুদা বলে ডাকে, তার খুব একটা ভালো লাগল না। সে খালি বলে, এই বাড়িটা কীরকম যেন অন্ধকার—অন্ধকার, জঙ্গল—জঙ্গল। বাড়ির ভেতরে কি কেউ এত গাছপালা লাগায় দাদাবাবু?

গাছ জিনিসটা নির্মাল্যবাবু আর তাঁর স্ত্রী মৌটুসি, দুজনেরই খুব প্রিয়। তাই তারা ও ব্যাপারে বিজুদার আপত্তিতে পাত্তা না দিয়ে আরও নতুন নতুন গাছ আমদানি করতে লাগল। তাদের পুরনো বাড়িতে মালি ছিল। নতুন পাড়ায় এসে সেই পুরনো মালিকে আর পাওয়া গেল না। তার বদলে কমল নামে এক চটপটে ছোকরা কাজে লাগল। সে প্রতি শনিবার বিকেলে সোনারপুর থেকে সাইকেল চালিয়ে আসে। থলি থেকে চটপট খুরপি, পোকামারা ওষুধের স্প্রে, গাছ ছাঁটা কাঁচি ইত্যাদি বার করে বাগানের আর ঘরের সমস্ত লতাপাতা পরিচ্ছন্ন করে কেটেকুটে দিয়ে চলে যায়।

গাছপালা যেখানে যা লাগানো হয়েছিল সবই নির্মাল্যবাবুর নিজের প্ল্যান অনুযায়ী। শুধু একটা ব্যাপারেই তাঁর প্ল্যানটা তিনি খাটাতে পারছিলেন না। নির্মাল্যবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছে, বাড়ির ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা চামেলি লতার কুঞ্জ বানাবেন। সেই কুঞ্জে গ্রীষ্মে আর বর্ষায় থোকায় থোকায় ফুল ফুটবে, চামেলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ

হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। জ্যোৎস্না রাতে তিনি ওই কুঞ্জের নীচে একটা ইজি—চেয়ারে বসে চামেলির ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখবেন মেঘেদের দৌড়। কিন্তু এই লতাকুঞ্জ বানানোর কাজটাই আর হয়ে উঠছিল না।

কারণটা খুব সামান্য। তিনি একটা মনের মতন মাচা পাচ্ছিলেন না।

হ্যাঁ, ছাদের মাঝখানে লতাকুঞ্জ বানাতে গেলে একটা শক্তপোক্ত কাঠামো না হলে চলে না, যেটাকে চলতি ভাষায় মাচা বলে। ওই কাঠামোর খুঁটি বেয়েই লতাগাছ ওপরে উঠবে, তারপর কাঠামোর ছাদে সেই লতা ছড়িয়ে পড়বে। তবেই না তৈরি হবে চামেলির কুঞ্জ। কিন্তু এমন সুন্দর বাড়ির ছাদে কি বাঁশ কিংবা লোহার চালু মাচা ব্যবহার করা যায়? দেখতে অত্যন্ত বেমানান লাগবে না?

নির্মাল্যবাবু ভেবেই পাচ্ছিলেন না, তাঁর বাড়ির ওই 'অ্যান্টিক—লুক'—এর সঙ্গে মানানসই করে কীভাবে একটা কাঠামো বানানো যায়। এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছুটা পড়াশোনাও করে ফেললেন। পড়েটড়ে আর পুরনো বইয়ের ছবি দেখে তিনি বুঝলেন, প্রাচীন কালের সাহেবি বাংলো আর জমিদারদের বাগানবাড়িতে অমন লতাকুঞ্জ হামেশাই থাকত। সেগুলো ছিল অনেকটা চারিদিক খোলা মন্দিরের মতন। কোনো দেয়াল থাকত না, শুধু কয়েকটা থামের ওপর চুড়োটা থাকত। সেই চুড়োর ওপরেই ছড়িয়ে পড়ত মাধবী, চামেলি, আইভি কিংবা আঙুরের মতন নানান বাহারি লতা।

নির্মাল্যবাবু স্বপ্নেও কখনো ভাবেননি যে, অমন একটি রেডিমেড কাঠামো তিনি পেয়ে যাবেন। নতুন নয়, পুরনো। সত্যিকারের অ্যান্টিক।

স্বপ্নের জিনিসটা তিনি পেলেন গিরিপানির রাজবাড়িতে।

দুই

গিরিপানি জায়গাটা ওড়িশার কটক থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। পাহাড়ি এলাকা, জঙ্গলে ঢাকা। বেড়াবার পক্ষে আদর্শ।

নির্মাল্য বসু কিন্তু ওখানে বেড়াতে যাননি, কাজেই গিয়েছিলেন। ওখানকার রাজপরিবারের এখনকার বংশধর রাজা সুপ্তিনাথ মহাপাত্র সাহেবি কেতার মানুষ। রাজত্ব নেই তো কী হয়েছে? তাঁর দুটো জাহাজ, একটা কাগজের কারখানা আর তিনটে বড় হোটেল রয়েছে। সোজা বাংলায় রাজ্য না থাকলেও রাজা সুপ্তিনাথ ভয়ঙ্কর পয়সাওলা লোক।

তো, এই রাজামশাই পূর্বপুরুষদের সাতমহলা বাড়ি ছেড়ে ওইখানেই নতুন করে বানানো একটা আধুনিক প্যালেসে উঠে যাচ্ছেন। আর সেই প্যালেসের ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের ভার দিয়েছেন নির্মাল্য বসুকে।

গিরিপানিতে গিয়ে নির্মাল্য বসু পুরো দুদিন ধরে নতুন বাড়িটা দেখলেন— যে বাড়িটা তাঁকে সাজাতে হবে। বাড়ির সমস্ত জায়গার ছবি তুললেন, মাপজোখ নিলেন, নোট—টোট লিখলেন। তৃতীয়দিন সন্ধেয় তাঁর ফেরার ট্রেন ছিল। কাজেই সেদিন দুপুরে তিনি রাজবাড়ির এক

পরিচালককে সঙ্গী করে পুরনো রাজবাড়িটা দেখতে বেরোলেন।

সেই রাজবাড়িতে অবশ্য দেখার মতন বিশেষ কিছুই ছিল না। বাড়িটা বড় হলেও মোটেও সুন্দর নয়। তার ওপর কালের প্রহারে জীর্ণ। রাজকীয় আসবাব কিংবা ছবিটবি যা ছিল, সবই রাজা সুপ্তিনাথ হয় বিক্রি করে দিয়েছেন, নাহলে নতুন বাড়িতে তুলে এনেছেন। বেজার মুখে নির্মাল্যবাবু রাজবাড়ির পেছনের বাগানটার দিকে হাঁটা লাগালেন এবং সেখানে পৌঁছেই তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন পেছনের বাগানে এক কোনায়, অবিকল তিনি যেমনটা চেয়েছিলেন, তেমনি এক কাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দাঁড়িয়ে রয়েছে' মানে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ছটা কাঠের থামের মধ্যে তিনটেই ভেঙে পড়েছে। তাই চুড়োটাও একদিকে হেলে পড়েছে। পুরো কাঠামোটার কোথাও একফোঁটা সবুজের চিহ্ন নেই। তবে এককালে নিশ্চয় ওটাকে ঘিরে কোনো বাহারি লতা ফুল ফোটাত।

নির্মাল্যবাবু তাঁর সমঝদারের নজরে দেখে নিলেন—পুরো মন্ডপটার গায়ে অসামান্য কাঠ খোদাইয়ের আলপনা। তেমনি সুন্দর মন্ডপটার গড়ন। ওড়িশার মন্দিরের চুড়োগুলো যেমন অনেকগুলো স্তর সাজিয়ে তৈরি হয় ঠিক সেইরকম এর চুড়োর গঠনশৈলী। এখন জীর্ণদশায় পড়ে আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু একটু সারিয়ে সুরিয়ে নিলেই এর আসল সৌন্দর্য আবার বেরিয়ে আসবে।

নির্মাল্যবাবু তাড়াতাড়ি নতুন প্যালেসে ফিরে রাজা সুপ্তিদেবকে তাঁর ইচ্ছের কথা জানালেন। বললেন, তিনি ওই কাঠের মঞ্চটা কিনতে চান। মহারাজ শুনে তো ভারি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ওই মাধবী কুঞ্জটা তো ভেঙে চুরে গেছে। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ওটার জন্যে দাম আর কী নেব? আপনি এমনিই নিয়ে যান। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তারপর তিনি ম্যানেজারকে ডেকে হুকুম দিলেন, বোসসাহেব যে কাঠের মঞ্চটার কথা বলছেন, সেটা যেন এক্ষুনি কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। খরচপত্র সব সুপ্তিদেবের।

পরেরদিন নির্মাল্যবাবু কলকাতায় নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন, আর তারও ঠিক দুদিন বাদে ট্রাকে চেপে সেই কাঠের মঞ্চ কলকাতায় চলে এল। সেটাকে সারাতে আরও পনেরোদিন লাগল। তরপর নির্মাল্যবাবুর ছাদের মাঝখানে তাঁর অনেকদিনের শখ মিটিয়ে চামেলির মঞ্চ বসে গেল। এখন শুধু কমলকে বলে একটা ভালো জাতের চামেলির চারা এনে ওটার গায়ে তুলে দেওয়ার অপেক্ষা।

সমস্যা হল নির্মাল্যবাবুদের কাজের লোক বিজুদাকে নিয়ে। সে তো এই নতুনবাড়িতে আসার পর থেকে এমনিতেই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকত। এই মঞ্চটা ছাদের মাঝখানে যেদিন খাড়া হল, তার কদিন পরেই সে একেবারে ফ্যাকাসে মুখে মৌটুসির সামনে মেঝের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। বলল, দিদিমণি, ওই মাচাটাকে বিদায় কর। ওটা ভূতুড়ে।

মৌটুসি তো শুনে হেসেই বাঁচে না। বলে, ভূতুড়ে কেন গো বিজুদা? কী হয়েছে?

বিজনবিহারী বলল, আমি তো রাতে ওই ছাদের লাগোয়া চিলেঘরেই শুই। বুড়ো হয়েছি বলে ভালো ঘুম হয় না। রাতের বেলা মাঝেই মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। তা, কদিন ধরে ঘুম ভাঙলেই জানলা দিয়ে দেখছি, ওই কাঠের ছাউনিটার নীচে কে যেন বসে আছে। যতবারই কে? কে? বলে আওয়াজ দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

মৌটুসি চিন্তিত মুখে বলল, চোর টোর নয় তো বিজুদা?

তোমারও যেমন কথা দিদিমণি। দোতলার ছাদে চোর উঠবে কোথা দিয়ে? কেনই বা উঠবে? ছাদ থেকে নীচে নামার দরজা তো তোমরা ভোর হওয়ার আগে খোলো না। কাজেই চোর যদি ছাদে ওঠে, তাকে সারা রাত ছাদেই বসে থাকতে হবে। না, দিদিমণি, এ চোর নয়, ভূত।

মৌটুসি বলল, কেমন দেখতে তোমার ভূতকে?

অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বিজনবিহারী উত্তর দিল, খালি গা, ফরসা ধবধবে গায়ের রং। সুন্দর করে ধুতি পরা, আর গলায় একটা চাদর জড়ানো। উদাস মুখে সে ওই মন্দিরের মেঝেতে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

মৌটুসি হেসে বলল, এবার বুঝেছি। সাদা ধুতি, সাদা চাদর, ফরসা গায়ের রঙ। তোমার ভূতের সবটাই আসলে চাঁদের আলো দিয়ে বানানো। ওই মঞ্চের ফাঁক ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে যখন নীচে পড়ে, তখন আলোছায়ার কারিকুরিতে মনে হয় একটা মানুষ বসে আছে। তুমি ও

নিয়ে ভেবো না বিজুদা। ভয় করলে বরং আজ থেকে একতলার বৈঠকখানায় শুয়ো।

বিজনবিহারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে দিদিমণি। তুমি যাই বলো, আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করি কেমন করে? আজ থেকে আমি নীচেই শোব।

তিন

রুম্পা, মানে চার বছরের কমলিনী বসু কিন্তু বিজুদার মতন অত ভয়টয় পায়নি। সে ক্রিসমাসের ছুটিতে ছাদের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে পুতুল খেলছিল। খেলতে খেলতেই সে আড় চোখে দেখেছিল সেই লোকটাকে। বাবা গাছঘর বানাবে বলে যে কাঠের মন্দিরের মতন জিনিসটা নিয়ে এসে ছাদের মধ্যিখানে রেখেছে, সেই ঘরটার নীচেই লোকটা গালে হাত দিয়ে বসেছিল।

পুতুল খেলতে খেলতেই রুম্পা জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার বুঝি মন খারাপ?

লোকটা জবাব দেয়নি।

রুম্পা বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে?

এবারেও কোনো জবাব না পেয়ে রুম্পা ভেবেছিল হাত ধরে ওকে টেনে আনবে। কিন্তু পুতুল রেখে যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন আর লোকটাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আরও অবাক কাণ্ড, একটু বাদে সে দেখল তার মেয়ে পুতুলটার কপালে কে যেন সুন্দর করে চন্দনের আলপনা দিয়েছে।

আরও দু'চারবার এরকম ঘটনা ঘটার পর রুম্পা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, খেলবার ইচ্ছেই যদি আছে, তাহলে সামনে এসে খেল না কেন?

কিন্তু লোকটা এবারেও কোনো জবাব দিল না।

এই ঘটনাটার কথা যখন রুম্পা তার মাকে বলল, তখন মৌটুসি বলল, তুই নিশ্চয় বিজুদার হাবিজাবি গল্পগুলো শুনেছিস। আর এখন নিজে ওইরকম গল্প বানাচ্ছিস।

রুম্পা বলল, মোটেই আমি বানিয়ে বলছি না। তুমি নিজে গিয়ে দ্যাখো।

হ্যাঁ, দেখতে গিয়েছিল মৌটুসি। তবে তখনই নয়। দুপুরবেলায় রুম্পাকে ঘুম পাড়িয়ে সে চুপিচুপি ছাদে উঠে গিয়েছিল, কিন্তু গাছঘরের নীচে কাউকে বসে থাকতে দ্যাখেনি। দেখতে যে পাবে না সে ব্যাপারে মৌটুসি নিশ্চিত ছিল। তবে ওখানে দাঁড়িয়েই মৌটুসি একটা গন্ধ পেয়েছিল। চাঁপাফুলের গন্ধ। তাদের বাড়িতে চাঁপাফুলের গাছ নেই। তাছাড়া শীতকালে চাঁপাফুল ফোটেও না। মৌটুসি প্রথমে একটু অবাক হলেও, পরে ভেবেছিল, উত্তুরে হাওয়ায় অনেক দূর থেকে কোনো ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে নিশ্চয়। যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে সে আর বেশি ভাবেনি। আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছিল।

সেদিনই সন্ধেবেলায় রুম্পাকে বাড়িতে রেখে নির্মাল্যবাবু আর মৌটুসিকে একটু বেরোতে হল। কিছু কেনাকাটার ছিল। দিনটা ছিল শনিবার। শনিবার যেহেতু নির্মাল্যবাবুর কাজ কম থাকে তাই সেই দিনটায় ওরা প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে আসে। কোনো দোকান

টোকানে গেলে রুম্পা ভীষণ বায়না করে। তাই সেরকম কোথাও গেলে ওরা রুম্পাকে বিজুদার কাছে রেখে দিয়েই বেরোয়। ফেরবার সময় রুম্পার জন্যে ছোটখাটো কিছু কিনে আনতে হয় ঠিকই, তবু এই ব্যবস্থাতে ঝামেলা কম।

সেদিনও বেরোবার আগে ওরা দেখে গেল, কমল ছাদের বাগানে কাজ করছে, রুম্পা কমলের পায়ে পায়ে ঘুরছে আর যথারীতি আপনমনে বক বক করছে। বিজুদা নিচেই ছিল। রান্নাঘরে কাজ করছিল। সে নির্মাল্যবাবুরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

তাই একটু পরে মোবাইলে বিজুদার কথাগুলো ওদের এত অবিশ্বাস্য লেগেছিল। বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে বোধহয় আধঘণ্টাও কাটেনি, বিজুদা বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করে বলেছিল, দাদাবাবু, শিগ্গির আপনারা চলে আসুন। বড় বিপদ হয়ে গেছে।

যত জোরে পারে গাড়ি ড্রাইভ করে নির্মাল্যবাবু আর মৌটুসি বাড়ি ফিরলেন। বিজুদা দরজা খুলতেই রুম্পা ছুটে এসে মা—কে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রুম্পা তো ঠিকই আছে। তাহলে কার বিপদ হল? নির্মাল্যবাবু কিছু বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বিজুদাকে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বার বার সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করছিলেন।—বিজুদা, বিজুদা। কী হয়েছে? কার বিপদের কথা বলছিলে? কী হয়েছে? কথা বলছো না কেন? ও বিজুদা...

বিজনবিহারীর অবস্থাটা তখন ঠিক সম্মোহিত কোনো মানুষের মতন। তার চোখে যেন দৃষ্টি নেই। মুখে কথা

নেই। শুধু কোনোরকমে ইশারায় ছাদের দিকে আঙুলটা তুলে দেখালো। মৌটুসি আর নির্মাল্যবাবু পড়িমরি করে দৌড়ে ছাদে উঠে এসে যা দেখলেন, তাতে ওদেরও বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সেই কাঠের মঞ্চের নীচের কমলের নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে। কমলের শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, কোনো রক্ত নেই। শুধু মৃত্যুর পরেও তার চোখদুটো যেন ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, প্রচণ্ড এক আতঙ্কেই কমলের শরীর থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ ধরে বিজুদা আর রুম্পার মুখে ভাঙা ভাঙা বিবরণ শুনে নির্মাল্যবাবু আর মৌটুসি যা উদ্ধার করতে পারল তা হল এই :

ওঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কমল রুম্পাকে চেপে ধরে ওর হাত মুখ বেঁধে ফেলে। তারপর ওকে নিয়ে যখন ছাদ থেকে নামতে যাবে...

রুম্পার ভাষায়, ঠিক তখনই সেই লোকটা, সেই ফরসা মতন, খালি গায়ে লোকটা দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে কমলের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই কমলের হাত আলগা হয়ে যায়। রুম্পা তার কাঁধ থেকে ছাদে পড়ে যায়। আর কমল তখনও একদৃষ্টিতে সেই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

রুম্পার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে লোকটার মুখ বলে কিছু ছিল না। মাথার ওপর দিয়ে জড়ানো চাদরের নিচে শুধু এক অন্ধকার শূন্যতাই জমে ছিল।

চার

এর পর যা যা হয় সবই হয়েছিল। পুলিশ এসেছিল নির্মাল্যবাবুর বাড়িতে। তারা কমলকে দেখেই চিনতে পারে। এর আগেও একটা কিডন্যাপিং—এর কেসে কমলকে তারা সন্দেহ করেছিল। তবে প্রমাণের অভাবে সেবার কমলকে আটকাতে পারেনি।

বোঝাই যাচ্ছে এবারেও কমল রুম্পাকে কিডন্যাপ করতেই চেয়েছিল। বিজনবিহারীর মতন এক বৃদ্ধকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলতে তো ওর বেশি সময় লাগত না। বাইরে রাস্তায় নিশ্চয় তার সঙ্গীরাও গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। শুধু সেই অশরীরীর আবির্ভাব আর তাকে দেখে কমলের হঠাৎ মৃত্যুই তাদের সাজানো পরিকল্পনা বানচাল করে দিল।

পুলিশ কমলের মৃত্যুটাকে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক বলেই মনে করেছে। পোস্ট—মর্টেম রিপোর্টও সেরকমই বলছে। কাজেই পুলিশের কাছেও কেস বাতিল হয়ে গেল।

বাতিল হল না শুধু নির্মাল্যবাবুর কাছে। বাড়ির পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পরেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন গিরিপানির রাজবাড়িতে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওই ছাউনিটার পেছনে এমন কোনো ইতিহাস আছে যার জন্যেই ওই বিষণ্ণ অশরীরী বার বার ওটার নিচে ফিরে আসে।

সে কে?

সেই উত্তরটা জানবার জন্যেই নির্মাল্য বসু আবার ফিরে গেলেন গিরিপানিতে। রাজা সুপ্তিদেব সব শুনে মোটেই

হেসে উঠলেন না, বরং গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, মিস্টার বোস, আমি ছোটবেলা থেকেই ওই ছাউনিটার সঙ্গে জড়িত একটা কাহিনির কথা শুনছি। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি গ্রাম্য মানুষজনের কল্পনা। তাই সেদিন আপনাকে সে কথা বলিওনি। কিন্তু আজ আপনি যা বলছেন, তার সঙ্গে সেই কাহিনি বেশ মিলে যায়।

একটু ভেবে নিয়ে সুপ্তিদেব মহাপাত্র বলতে শুরু করলেন :—

আমার দাদুর বাবা তখন গিরিপানির রাজা। তখন রাজারা ছিলেন সত্যিকারেই রাজা। আমার মতন নাম কে ওয়াস্তে রাজা নন। ওই পুরনো রাজবাড়ি তখন লোক লস্করে গম গম করত। সৈন্য ছিল, সামন্ত ছিল, হাতি ঘোড়া সবই ছিল। আর সেই রাজার ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। রাজকুমারী সুহাসিনী। রানিমা আর রাজামশাই তাকে আদর করে হাসি বলে ডাকতেন।

এই হাসিকেই একদিন রাজবাড়ির বাগান থেকে কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। কাজটা সহজ ছিল না। কারণ, বুঝতেই পারছেন, একজন রাজকুমারী তো আর বিনা পাহারায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় না। হাসির সঙ্গেও পাহারাদার ছিল। উনিশ কুড়ি বছরের সেই ছেলেটার নাম ছিল বলরাম। সে ছিল হাসির সব থেকে বড় বন্ধু। সে ঘোড়া হত, হাসি তার পিঠে চাপত। গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে সে হাসির জন্যে চাঁপা ফুল পেড়ে আনত। হাসির পুতুলের জন্যে সে কাঠকুটো দিয়ে চমৎকার পুতুলের ঘর বানিয়ে দিত।

বলরাম আর হাসির প্রিয় খেলার জায়গা ছিল বাগানের এক কোনায় নিরিবিলি দাঁড়িয়ে থাকা ওই লতা কুঞ্জ। তখন ওই কুঞ্জ ঘিরে মাধবীলতার বন ছিল। ওখানেই চারবছরের হাসি তার বলরামদাদার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা করে কাটিয়ে দিত। যেদিন সুহাসিনী হারিয়ে যায়, সেদিনও সে বলরামের সঙ্গে ওই মাধবীকুঞ্জেই খেলা করছিল।

তবু সুহাসিনী কীভাবে হারিয়ে গেল?

স্বাভাবিকভাবেই অনেকে সন্দেহ করেছিল, বলরাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রতিবেশী কোনো রাজার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে নিজেই সুহাসিনীকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। তা ছাড়া আর কীভাবে রাজকুমারীর হারিয়ে যাওয়া সম্ভব?

বলরামের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হয়নি যে তার বড় কারণ, রানিমা, মানে হাসির মা। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না যে বলরাম হাসির কোনো ক্ষতি করতে পারে। বরং তিনি বলরামের কথাই বিশ্বাস করলেন :— সে না কি হাসির বায়নায় বাগানের পদ্মদিঘি থেকে পদ্মফুল তুলে আনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর হাসিকে দেখতে পায়নি।

হাসি হারিয়ে যাওয়ার পর ঠিক এক সপ্তাহ বলরাম বেঁচেছিল। ওই এক সপ্তাহ সে পাগলের মতন রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। ওই কদিন তাকে কেউ খেতে দ্যাখেনি, ঘুমোতে দ্যাখেনি। সারাক্ষণ সে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় হাসিকে খুঁজে বেড়াত। এক সপ্তাহ বাদে হাসি আর বলরামের প্রিয় খেলার জায়গা ওই মাধবীকুঞ্জের

নীচ থেকে বন্দুকের আওয়াজে সবাই চমকে ওঠে। সবাই দৌড়ে গিয়ে দ্যাখে বলরাম ওই কাঠের ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার হাতে ধরা বন্দুক থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বলরাম কি আত্মহত্যা করেছিল? না কি বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে আচমকাই তার হাত থেকে গুলি ছুটে গিয়েছিল? সে কথা কেউ স্থির করে কোনোদিনই বলতে পারেনি।

তবে আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বলরাম বেঁচে থাকতে যে ভুল করেছিল, মৃত্যুর পর সেই ভুল আর দ্বিতীয়বার করেনি। একবার সে হাসিকে হারিয়েছিল। অন্যমনস্কতার সুযোগে রুম্পাকে আর হারাতে দেয়নি।

গিরিপানি থেকে ফিরে আসার পর নির্মাল্যবাবু সেই কাঠের মঞ্চটাকে আবার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ তাঁর এবং মৌটুসির বিশ্বাস— আজও গিরিপানির ওই প্রাচীন প্রাসাদের পরিত্যক্ত বাগানে, ওই ভাঙা মাধবীকুঞ্জের নিচে শুধু বলরাম নয়, হাসিও ফিরে আসে। ওখানেই তারা আজও খেলাঘর সাজায়।

জেনেশুনে কি কেউ কোনো শিশুর খেলাঘর নষ্ট করে?

কুয়াশার আড়ালে ওরা আসে



এক

চোখ মেলার পরেও সুমন্ত বুঝতে পারছিল না, এমন হঠাৎ করে কেন তার ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে দেখতে পাচ্ছিল জানলার কাচে লেপটে রয়েছে ঘন অন্ধকার। সকাল হতে এখনও অনেক দেরি। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে বলেও তো মনে পড়ছে না। তাহলে?

ঠিক সেই সময়েই সুমন্ত শিসের শব্দটা শুনতে পেল।

অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল আওয়াজটা। খুব নিচু পর্দায় বাঁধা একটা শিস। ছোট্ট এবং সাবধানী শব্দটা একবার উঠেই মিলিয়ে গেল। সুমন্ত মনে মনে চিন্তা করল,

তাহলে কি কিছুক্ষণ আগেও কেউ এইভাবে শিস দিয়েছিল? সেই আওয়াজেই কি তার ঘুম ভেঙে গেছে?

হতেই পারে। সুমন্ত জানে তার ঘুম বেড়ালের ঘুমের মতন পাতলা। তার ব্রেনের একটা অংশ ঘুমের মধ্যেও সজাগ থাকে। গলির বাইরে রাস্তায় চুপিচুপি একটা জিপ এসে দাঁড়ানোর শব্দ, উঠোনের ইটে একটা লোহার সোল লাগানো জুতোর অসাবধানী ঠোক্কর কিংবা রিভলবারের সেফটি—ক্যাচ সরানোর একটা ছোট্ট ক্লিক শব্দেই কতবার তার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে যায় বলেই পুলিশের হাত এড়িয়ে এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই একটা শিসের শব্দ, যতই আস্তে হোক, যত দূর থেকেই সেটা ভেসে আসুক, তাকে জাগিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বালিশের নিচে রাখা রিভলবারটা হাতে নিয়ে সুমন্ত বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পা দিল। তার আগে সেলফোনের স্ক্রিনে সময় দেখল— দুটো সাঁইত্রিশ।

তখনই সে দ্বিতীয়বার শিসের আওয়াজটা শুনতে পেল। এবার যেন শব্দটা আরও একটু কাছে এগিয়ে এসেছে বলে মনে হল তার।

দিল্লি থেকে মথুরা অবধি যে নতুন এক্সপ্রেসওয়েটা তৈরি হয়েছে, তার দুপাশে ধু ধু ফাঁকা জমির মধ্যে ইদানীং একটা দুটো করে বাড়ি গজিয়ে উঠছে। সেরকমই একটা বাড়িতে এই 'নিসান্ত রিসর্ট'। লোকজনের চোখের আড়ালে দুয়েকদিন লুকিয়ে থাকবার পক্ষে পুরো হোটেলটাই আইডিয়াল। তবু আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সুমন্ত একতলায় পেছনদিকের একটা সস্তার ঘরই বুক করেছিল।

এই ঘরের জানলা খুললে ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সুমন্ত নিশ্চিত, আওয়াজটা দুবারই ওই মাঠের দিক থেকেকেই ভেসে এসেছে।

শিস দেওয়ার এই ভঙ্গিটাও তার খুব চেনা। গত তিনদিন ধরে মথুরানাথ শর্মার বাড়ির ওপর নজরদারি করার সময় অনেকবার সে এই শিস শুনেছে। কিন্তু এখন, রাত আড়াইটের সময়, ওই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে মথুরানাথ শর্মা শিস দিয়ে ঘুরছেন? বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া এ কথা কি কেউ ভাবতে পারে? মনে মনে নিজেকেই গালাগাল দিল সুমন্ত।

নিজেকে সুমন্ত বোঝাল শিস নয়, এ নির্ঘাত কোনো রাতচরা পাপিয়ার ডাক। কিন্তু শীতকালে কি পাপিয়া ডাকে? ঠিক মনে করতে পারছিল না সুমন্ত।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাল্লা দুটো খুলে ফেলল সুমন্ত, আর খুলেই অবাক হয়ে গেল। শুতে যাওয়ার আগে, যখন এই জানলার দাঁড়িয়ে শেষ সিগারেটটা খেয়েছিল, তখনও তো বাতাস বেশ পরিষ্কার ছিল। মাঠের ওপারে বাহারগঞ্জ কলোনির আলোগুলো যে মিটমিট করে জ্বলছিল, সেটা অবধি এখানে দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে জানলার সামনে এত বড় একটা সাদা পাঁচিল উঠে গেল কেমন করে?

না, পাঁচিল নয়, কুয়াশা। চাপ চাপ কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে সারা দুনিয়া। এর মধ্যে দিয়ে কিছু দেখতে পাওয়া

অসম্ভব। যদি কিছু শোনা যায়, এই আশায় আরও কিছুক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সুমন্ত। কিন্তু আমগাছটার পাতা থেকে টিনের চালের ওপর হিমের ফোঁটা ঝরে পড়ার টপ টপ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দই তার কানে এল না।

পাখির ডাকই হবে। মনে মনে বলল সুমন্ত। পাখির ডাককেই সে মথুরাবাবুর শিসের শব্দ বলে ভুল করছে। নাহলে মথুরাবাবু এখানে কেমন করে আসবেন? তাঁর বাড়ি তো মাঠের ওপাশে, ওই বাহারগঞ্জ কলোনিতে। আর তিনি তো অন্ধ। যার ভরসায় মথুরানাথ শর্মা চলাফেরা করতেন, সেই এলসাকে তো গতকাল রাতেই সুমন্ত নিজের হাতে শেষ করে দিয়েছে।

এলসাকে ছাড়া একা একা ওই জলাজমির মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন অন্ধ মথুরানাথ শর্মা? ইমপসিবল। গতকাল রাতে, কাজ কমপ্লিট করার পর, সুমন্ত নিজে ওই মাঠ ভেঙে বাহারগঞ্জ থেকে এই রিসর্টে ফিরে এসেছিল। তার দুটো শক্তপোক্ত পা আছে, দুটো জোরালো চোখের নজর আছে। তা সত্ত্বেও তার জান নিকলে গিয়েছিল ওই উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো জমিটা পার হয়ে আসতে। আর সেখানে ওই অন্ধ লোকটা এলসাকে ছাড়া একা একা এদিকে চলে আসবে?

হাঃ, ভাবলেও হাসি পায়।

আর তাছাড়া শিস দিয়ে ডাকবেনই বা কাকে মথুরাবাবু? কাকে ডিরেকশন দেবেন? এলসাই তো আর নেই।

দুই

হ্যাঁ, মথুরানাথ শর্মার সর্বক্ষণের সঙ্গী জার্মান শেফার্ড কুকুরটার নাম এলসাই ছিল। যে লোকটা মথুরানাথবাবুর আলমারিতে রাখা ক্যাশ পঁচিশ লাখ টাকার খবরটা সুমন্তকে দিয়েছিল, সেইই তাকে এলসার কথাও বলে দিয়েছিল। মথুরাবাবু নয়ডার একটা সিমেন্ট কারখানার সুপারভাইজার ছিলেন। বছর দুয়েক আগে কারখানায় একটা অ্যাকসিডেন্টে যখন তিনি দুটো চোখের দৃষ্টিই হারান তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। ওই বয়সে নতুন করে অন্ধকারের দেশে পা রাখা নিশ্চয়ই খুবই কঠিন কাজ, বিশেষ করে যে মানুষের তিনকুলে আর কেউ নেই। তবে মথুরাবাবুর সেই কাজটা সহজ করে দিয়েছিল এলসা। অন্ধ মানুষের সঙ্গী হিসেবেই এলসাকে তার ট্রেনার তৈরি করেছিল।

মথুরাবাবু লাঠি ব্যবহার করতেন না। তার হাতে ধরা থাকত এলসার গলার চেন। সুমন্ত নিজের চোখেই দেখেছে, এলসা কীভাবে মথুরাবাবুকে নিয়ে বাজার হাট ব্যাঙ্ক পোস্ট—অফিস সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করছে। খানাখন্দ বাঁচিয়ে, ট্রাফিকের স্রোত কাটিয়ে, সারাক্ষণ সবরকম বিপদ আপদ থেকে সে মথুরাবাবুকে আগলে নিয়ে ঘুরত।

শুধু বাইরে নয়, ঘরেও এলসা ছিল মথুরাবাবুর সহায়। পাড়ার চায়ের দোকানে বসে সুমন্ত গল্প শুনেছে, এলসা না কি মথুরাবাবুকে ছেড়ে রাখা চটি, স্নানের তোয়ালে,

ওষুধের প্যাকেট এসবও মুখে করে এগিয়ে দিত। মথুরাবাবুর সমস্ত কথা বুঝত এলসা।

অন্ধ ছিলেন বলেই মথুরাবাবু ব্যাঙ্ক কিংবা এটিএমের মাধ্যমে টাকাকড়ির লেনদেনে স্বস্তি পেতেন না। একটা বড়সড় অ্যামাউন্টের টাকা সব সময় বাড়িতেই রাখতেন, কারণ তার নিজের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কদিন আগেই একবার হার্ট—অ্যাটাক হয়েছিল। আবার কখন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, কত টাকা হাসপাতালকে দিতে লাগে— এইসব ভেবেই একেবারে পঁচিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ির আলমারিতে এনে রেখেছিলেন। যদিও ওঁর বাড়িটা ছিল কলোনির একেবারে শেষপ্রান্তে, তবুও তিনি অত টাকা বাড়িতে রাখতে ভয় পাননি। কেন ভয় পাননি সেটা বোঝা কঠিন নয়। ওরকম একটা বাঘের মতন কুকুর বাড়িতে থাকলে চোর ডাকাতের ভয় করবে কেন লোকে?

তবু সুমন্ত রিস্কটা নিয়েছিল। প্রায় তিনদিন টানা মথুরাবাবুর বাড়ির ওপর নজর রেখে সে বুঝে নিয়েছিল এলসাকে আটকাতে গেলে তাকে কী করতে হবে। রাতেরবেলা বাড়ির বাইরের ফাঁকা জমিটায় ঘুরে বেড়াত এলসা। কোনো প্রয়োজন হলে তাকে শিস দিয়ে ভেতরে ডেকে নিতেন মথুরাবাবু। শিস দিয়েছিল সুমন্তও। মথুরাবাবুর আওয়াজ নকল করে পেছনের বাগান থেকে ছোট্ট একটা শিস। কাল রাত আড়াইটেয়। একটু সন্দেহ কি আর হয়নি এলসার? তবে ওই শিসটার জন্যেই সুমন্তর সামনে পৌঁছেও তার রুদ্রমূর্তি ধরতে একটু দেরি হয়ে

গিয়েছিল তার। ওই দু—এক মুহূর্তের দেরিটুকুই দরকার ছিল সুমন্তর। ওই সময়টুকুর মধ্যেই প্রথম হান্টিংনাইফটা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে গিয়ে এলসার পাঁজরে বিঁধে গিয়েছিল। পরেরটা গলায়। ব্যস, সব শেষ।

অন্ধেরা কি মৃত্যুর গন্ধ পায়? নাহলে এলসাকে বাগানে ফেলে রেখে ঘরে পা দেওয়া মাত্র মথুরাবাবু কেন এলসার জন্যে হাহাকার করে উঠবেন?

টাকার জন্যে নয়, এলসার জন্যেই আর্তনাদ করে উঠেছিলেন মথুরাবাবু— বরবাদ হয়ে গেলাম। আমি বরবাদ হয়ে গেলাম। কেমন করে বেঁচে থাকব, যদি এলসা না থাকে? তুমি টাকা নিয়ে যেতে ভাই, আমি বাধা দিতাম না। কিন্তু এলসাকে কেন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে তুমি?

অমন চিৎকার বেশিক্ষণ চলতে দিলে লোকজন ছুটে আসত। তাই বাধ্য হয়েই মথুরাবাবুর মাথায় রডের একটা জোরালো বাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সুমন্ত।

পুরোপুরি অজ্ঞান অবশ্য হয়নি লোকটা। নিজের রক্তের মধ্যেই নিজে উপুড় হয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছিল। আলমারি থেকে নোটের বান্ডিল—গুলো নিয়ে ব্যাক—প্যাকে ঢোকাতে ঢোকাতে সুমন্ত শুনেছিল আধা অচৈতন্য লোকটা বলছে— স্কাউন্ড্রেল, তুই পালাতে পারবি না। আমি ঠিক তোর কাছে পৌঁছে যাব। এলসাকে নিয়েই পৌঁছে যাব তোর ডেরায়। এলসাকে তুই চিনিস না। দরকার হলে দুনিয়ার কোনায় কোনায় ঘুরে ও ঠিক তোকে খুঁজে বার করবে।

তখন তো কথাগুলোকে মনে হয়েছিল একজন আহত লোকের প্রলাপ। কিন্তু এখন ওই কথাগুলোই কেন যেন সুমন্তর কানের ভেতর বার বার বেজে উঠছে। তোর কাছে পৌঁছে যাব... তোর কাছে... পৌঁছে যাব।

জানলা থেকে বিছানার দিকে ফিরে যেতে গিয়েও ফিরতে পারল না সুমন্ত। তার পা দুটো জমে পাথর হয়ে গেল। কারণ এইমাত্র তৃতীয়বার শিসের শব্দটা শুনতে পেয়েছে সে। আর তার সঙ্গে আরও একটা শব্দ। একটা জাত কুকুরের ভরাট গলার হুঙ্কার।

মাত্র একবার ডেকে উঠেই থেমে গেল কুকুরটা। সুমন্তর মনে হল কে যেন চাপা হিসস শব্দ করে কুকুরটাকে থামিয়ে দিল।

সুমন্ত সম্মোহিতের মতন ধীরে ধীরে জানলার কাছে ফিরে গিয়ে বাইরে তাকাল।

তিন

নাঃ, এই হতভাগা কুয়াশার জ্বালায় কিচ্ছু দেখা যাবে না। বিশাল ধূসর এক ময়ালসাপের মতন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুয়াশার স্তূপ। শেষ রাতের হাওয়ায় মাঝে মাঝে এখানে ওখানে একবার করে সেই সাপের পাক আলগা হচ্ছে। দু এক পলক দেখা যাচ্ছে একটা গাছ, একটা ল্যাম্প—পোস্ট কিংবা মেহেদি গাছের বেড়ার আবছা সিল্যুয়েট। সেরকম ফাঁক ফোকরগুলোর দিকেই তীক্ষ্ন নজর রাখছিল সুমন্ত। যদি কিছু দেখা যায়।

দেখতে গিয়ে একবার সে এতটাই চমকে উঠেছিল যে, মনে হয়েছিল হৃদপিন্ডটা বুঝি লাফিয়ে বুকের বাইরে চলে

আসবে। সে যেন পরিষ্কার দেখেছিল মথুরাবাবু একটু দূরে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এমনকী মথুরাবাবুর মণিহীন দুটো চোখও সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল। সেই চোখদুটো এই ঘরের দিকেই তাকিয়েছিল। অবশ্য কুয়াশা এসে যখন আবার মথুরাবাবুকে ঢেকে দিচ্ছে তখন তার মনে হয়েছিল ওটা মথুরাবাবু না হয়ে পাম্প—হাউসের দেয়ালের ওপর চুনকামের একটা পোচড়াও হতে পারে।

কিন্তু এবারে? এবারে? আর তো কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো, পাম্প—হাউসের সামনের সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরটার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল দুটো ছায়ামূর্তি।

একটা মানুষের ছায়া। আর একটা কুকুরের।

কুকুরটা চলে গেল প্রথমে। বিশাল বড় কুকুর, মুখটা ছুঁচলো। লোমে ভরা ল্যাজটা চামরের মতন দুলছে। মরার পরেও এলসা একটুও বদলায়নি। ঠিক পেছনেই হেঁটে গেল মানুষটা। হাতে কুকুরের গলার চেন। নাঃ, লোকটার কথার দাম আছে। বলেছিল পৌঁছে যাব। পৌঁছে গেছে ঠিক।

আর কোনো শিসের আওয়াজ নেই, কারণ তার প্রয়োজনও নেই। সুমন্ত দেখেছে, এলসা মাটির সঙ্গে নাক লাগিয়ে ছুটে আসছে। ও সেই হাতের গন্ধ পেয়ে গেছে, যে হাতে ধরা ছিল ওর গলায় গাঁথা হান্টিং—নাইফের বাঁট।

কিন্তু সুমন্ত এখন কী করবে? মেহেদির বেড়াটাকে পাক দিয়ে এড়িয়ে ওরা নিশ্চয় এই ঘরটার দিকেই এগিয়ে

আসছে। কতক্ষণ লাগবে এলসার এখানে পৌঁছতে? দু মিনিট? তিন মিনিট? তার মধ্যে পালাতে পারবে না সে?

চরম আতঙ্কে সুমন্ত দরজাটা হাট করে খুলে দৌড় লাগাতে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কুয়াশার আড়াল ছিঁড়ে, বিকট গর্জন করে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই অমানুষ অনুসরণকারী।

শাবাশ ডিউক!

নয়ডা পুলিশের ডগ—স্কোয়াডের হাবিলদার পরমেশ্বর সিং তার প্রিয় স্নিফার ডাক ডিউকের পিঠে দুটো চাপড় মেরে তাকে মাটিতে পড়ে থাকা সুমন্তের বুকের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে নিল। তারপর ও.সি. বিকাশ জয়সোয়ালের দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, সত্যি স্যার, ক্রাইমের চব্বিশ ঘণ্টা বাদে কটা কুকুর এইভাবে ক্রিমিনালের গন্ধ ফলো করে তাকে ধরতে পারবে বলুন তো? ডিউক একটা জিনিয়াস।

বিকাশ জয়সোয়াল তখনই পরমেশ্বরের কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি সুমন্তর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পালস দেখছিলেন। তার নজর কিন্তু আটকে ছিল সুমন্তর দুটো চোখের দিকে। খোলা চোখদুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

একটু বাদে নিজের মুঠো থেকে সুমন্তর নেতিয়ে পড়া হাতটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন বিকাশ জয়সোয়াল। অবাক গলায় বললেন, এ তো হার্টফেল করে মরে গেছে মনে হচ্ছে পরমেশ্বর। সুমন্ত দুবের মতন একটা পাকা ক্রিমিনাল কী দেখে এত ভয় পেল বলো তো?

পরমেশ্বর সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না।

নীল চিতার হিম আগুন



এক

"আপনিই কি ঘাটবাবু?"

কাউন্টারের ওপাশে মড়ার নাম—ঠিকানা লেখার মোটা খাতাটার ওপর মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিলেন শিবাইকালী শ্মশানের ঘাটবাবু নিতাই নস্কর। ঝিমুনির মধ্যেই হেঁড়ে গলার প্রশ্নটা তার কানে এল। তিনি বিশেষ পাত্তা দিলেন না। মাথা না তুলেই জবাব দিলেন, "মড়া পোড়ানো বন্ধ। বাইরে নোটিশ দ্যাখেননি? ইলেকট্রিক চুল্লি খারাপ হয়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হালকা ঘুমের মধ্যেই নিতাইবাবু ভাবলেন, আপদ বিদায় হয়েছে। কিন্তু তখনই আবার বাজখাঁই গলায় দ্বিতীয় প্রশ্ন ভেসে এল—"চুল্লিটা কোথায়? একটু দেখতে হবে যে।"

এবার ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নিতাই নস্কর। দেখলেন কাউন্টারের গ্রিলের সঙ্গে নাকটাকে প্রায় ঠেকিয়ে প্রশ্নকর্তা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রথম দর্শনেই নিতাইবাবুর মনে হল ভদ্রলোক একদম ঠিক জায়গায় চলে এসেছেন। শ্মশানই এঁনার বসবাসের পক্ষে আদর্শ জায়গা। একেবারে যমদূতের জেরক্স—কপি। মুশকো চেহারা, উস্কো খুস্কো চুল, গায়ে একটা তেলচিটে নোংরা ফুলহাতা জ্যাকেট আর মাথায় টুপি। শুধু ভদ্রলোকের চশমার পুরু কাচে ঢাকা বড় বড় চোখদুটো কোনো যমদূতের চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। একেবারে হীরের কুচির মতন ঝকমকে দুটো চোখ।

নিতাইবাবু অফিসঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তার মাথা ছাড়িয়ে প্রায় হাতখানেক উঁচুতে লোকটার মাথা। কত হাইট হবে ওর? সাড়ে ছয়? ছয় আট? যাই হোক, সেই উচ্চতা থেকেই লোকটা আবার গুরু গম্ভীর স্বরে বলল, "হাতে বেশি সময় নেই। চলুন।"

নিতাইবাবুর মাথাটা ভালো কাজ করছিল না, তাই চুল্লি—সারাই কোম্পানির লোককে যে তিনি নিজেই ফোন করে ডেকেছিলেন সে কথাটা মনে পড়তে একটু সময় লাগল। মাথাকে দোষ দেওয়া যায় না অবশ্য। কাল রাত থেকে যে ঝামেলা চলছে, তাতে যে কারুরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সে কথা মনে পড়তেই দাঁত কিড়মিড় করলেন নিতাইবাবু। মনে মনে বললেন, টেকনোলজির নিকুচি করেছে। নিকুচি করেছে ইলেক্ট্রিক চুল্লির। ভেতরে একটা

মড়া নিয়ে সেই যে রাত দেড়টার সময় ঘটাং করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ব্যস। তারপর থেকে না জ্বলছে চুল্লির ভেতরের ফারনেস, না খুলছে সামনের শাটার। যেন আলিবাবার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে কাশেম আর তারপর পাস—ওয়ার্ড ভুলে গিয়ে আলু ফাঁক, বেগুন ফাঁক করে বৃথাই চিল্লিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরে যে মড়াটা এখনও রয়ে গেছে, সেটাকে কালো ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল লোকাল থানার চারজন জমাদার। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিতাইবাবু বুঝেছিলেন, লোকটা ছিল বিন্নাগাছি রেল—ইয়ার্ডের এক কালের বড় মাফিয়া। নাম কানকাটা মধু। ইদানিং বয়েস বাড়ার ফলে ওর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছিল। মধুর ওয়াগন—ব্রেকিং—এর দলের লোকেরা সব ট্যারা খগেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে মধুকেই পেটাচ্ছিল। দিনের পর দিন ট্যারা খগেনের দলের কাছে এইভাবে ঝাড় খেতে খেতে গতকাল কানকাটা মধু মনের দুঃখে সুইসাইড করেছে। ওটা তারই লাশ। মধুর তিনকূলে কেউ নেই বলে পুলিশের ওপরেই দাহ করায় দায়িত্ব চেপে গেছে।

কুড়ি বছর ধরে শিবাইকালী শ্মশানের 'কেয়ার—টেকার', মানে 'ঘাটবাবু'—র চাকরি করতে করতে নিতাই নস্করের মনটা দড়কচা মেরে গেছে। সুইসাইড হোক কি অ্যাকসিডেন্ট, বাচ্চা হোক কি বুড়ো— লাশ হচ্ছে লাশ। ডেথ—সার্টিফিকেট মিলিয়ে ওই মোটা খাতাটায় নম্বর ফেলো। তারপর চুল্লিতে ঢুকিয়ে দাও। ব্যস, নিতাইবাবুর কাজ শেষ।

গতকালও তাই হয়েছিল। লাশের লাইনে কানকাটা মধুর টার্ন আসার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু আর ময়না দুই ডোম বডিটাকে চুল্লির সামনে কনভেয়রের ওপর শুইয়ে দিয়েছিল। এরপর মেঝেয় আটকানো বড় লিভারটা ধরে টানার সঙ্গে সঙ্গে কনভেয়রে চড়ে মধুর লাশ ঢুকে গিয়েছিল চুল্লির ভেতরে। ঘটাং করে লোহার শাটার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই অবধি সব ঠিকঠাকই ছিল। নিতাইবাবু নিজের অফিসঘরে ফিরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন। এমন সময় পেছন থেকে বাচ্চু ডোমের অবাক আওয়াজ ভেসে এল— "ও স্যার, ফারনেস তো নিভে গেল।"

"বলিস কী? বার কর! বার করে আবার ঢোকা!"— নির্দেশ দিয়েছিলেন নিতাইবাবু এবং সেই নির্দেশ মেনে পরপর যা করার করেও গিয়েছিল বাচ্চু আর ময়না। কিন্তু চুল্লির মধ্যে কোনো তাপ উত্তাপ দেখা যায়নি। অন্যান্যবার সুইচ টেপা মাত্র যে চুল্লির ভেতরটা প্রচণ্ড তাপে টকটকে লাল হয়ে ওঠে সেই চুল্লির গা আজ একদম ঠান্ডা। সবচেয়ে মুশকিলের কথা, শাটারটা অবধি খুলছে না। ভেতর থেকে মধুর বডিটা বার করে এনে যে অন্য শ্মশানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, তারও উপায় নেই।

মধুর পেছনে, লাইনে যে আরও তিনটে মড়া ছিল, তাদের শ্মশানসঙ্গীরা বেগতিক দেখে পাশের শহরে দাহ করতে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে হাই তুলে আর খৈনি ডলে, শেষমেশ বিরক্ত হয়ে পুলিশের জমাদার চারজনও ফিরে গেল থানায়। যাওয়ার আগে বলে গেল— "মেশিন

সারাই হলে আমাদের ডেকে নেবেন।" যে কোম্পানি চুল্লি বসিয়েছিল নিতাইবাবু তাদের ফোন করলেন। যে লোকটা ফোন ধরেছিল, সে বলল, "এত রাতে তো কিছু করা যাবে না স্যার। সকাল হলেই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নিতাইবাবু এখন ঘড়ি দেখলেন— সকাল সাতটা। চুল্লি—কোম্পানির লোকের কর্মতৎপরতায় খুশি না হয়ে পারলেন না নিতাইবাবু। আজকালকার দিনে কটা লোক এরকম কথা রাখে? সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি প্রসন্নমুখে যমদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নামটা কী ভাই?"

"ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র।" হেঁড়ে গলায় চটপট জবাব এল।

নিতাইবাবু মুহূর্তের মধ্যে সতর্ক হয়ে গেলেন। এ লোকটা পাগল, কিন্তু বলশালী। পরন্তু ময়না, বাচ্চু, পুলিশের জমাদার, কাছেপিঠে কেউ নেই। উপরন্তু এই শীতকালে চারিদিক অন্ধকার করে অসময়ের বৃষ্টি নেমেছে, ডাকলে কেউ শুনতে পাবে না। অধিকন্তু লোকটার হাতে একটা অন্তত পাঁচ কিলো ওজনের লোহার স্প্যানার, যেটা নিয়ে লোফালুফি করতে করতে সে কুটিল দৃষ্টিতে নিতাইবাবুর মাথার খুলির দিকে চেয়ে আছে। কাজেই কথা না বাড়িয়ে নিতাই নস্কর অত্যন্ত বিনয়ী গলায় বললেন, "আসুন, আসুন, ডক্টর মিত্র। আমিই আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

দুই

চুল্লির সামনেটায় শ্মশানযাত্রীদের বসার জায়গা আছে। মাথায় ছাদ, চারিদিকে দেয়াল। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা।

তবে একটু অন্ধকার বলে দিনের বেলাতেও একটা বাল্ব জ্বলছিল। ওটা সব সময়েই জ্বলে। আলোটার নিচে বসে সেই উন্মাদ চুল্লি—সারাইওয়ালা তাঁর পিঠের বিশাল ব্যাক—প্যাকটা খুলে সামনে নিয়ে এলেন। তারপর তার মধ্যে থেকে এটা ওটা পার্টস, তাতাল, মিটার, ডায়োড, এইসব বার করে একটা প্লাস্টিক শিটের ওপর সাজাতে সাজাতে নিজের মনেই কথা বলে যেতে লাগলেন। গলাটা তাঁর যেহেতু বেশ চড়া আর ভরাট, কাজেই পাশে দাঁড়িয়ে নিতাইবাবু প্রত্যেকটা শব্দই বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক বলছিলেন—

"প্রতিভা আর পয়সা এই দুটো জিনিস কদাচিৎ একসঙ্গে মেলে, বুঝলেন? আমার যেমন প্রতিভা আছে, কিন্তু পয়সা নেই। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ডুসেলডর্ফ ইউনিভার্সিটি থেকে বায়ো—টেকনোলজিতে ডক্টরেট করেছি। কাজেই প্রতিভার ব্যাপারটা নিশ্চয় আপনি অস্বীকার করবেন না?" সিদ্ধকাম আড়চোখে নিতাই নস্করের দিকে তাকালেন। নিতাই নস্কর সবেগে দুদিকে মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন, অস্বীকার করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবছেন না।

ভদ্রলোক মনে হয় খুশি হলেন। বললেন, "হুঁ। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার পয়সা নেই। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি, আর পরের গোলামি করবও না। এদিকে আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছি সেটা প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ এবং ঝুঁকিবহুল। ধরুন, এই রিসার্চ করতে গেলে নিয়মিত ডেড—বডির সাপ্লাই চাই। কে দেবে

আমাকে ডেড বডি? এটা তো আর মেরি শেলীর আমলের বিলেত নয়, যে কবর খুঁড়ে বডি নিয়ে চলে এলাম, আর একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বানিয়ে ফেললাম।"

নিতাইবাবু শুকনো মুখে ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইলেন যে, সত্যিই, কবর খুঁড়ে মৃতদেহ তুলে আনার সুবন্দোবস্ত না থাকায় তিনিও খুবই মর্মাহত।

সিদ্ধকাম মিত্র দুটো ডায়োডের মধ্যে তার জড়াতে জড়াতে বললেন, "তবে প্রতিভাধরদের কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। আমি ভেবে দেখলাম, শ্মশানে যে মড়া পোড়ানোর চুল্লিগুলো থাকে, সেগুলোর মধ্যে সার্কিট, চেম্বার সবই একেবারে যেমনটি চাই তেমনই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভেতরে মৃতদেহ অবধি রেডি। দরকার শুধু সার্কিটগুলো একটু ওলট পালট করে নেওয়া আর দু চারটে কেমিক্যাল ডেড বডির গায়ে মাখিয়ে দেওয়া। ব্যস, আমার কাজের বারো আনা তো ওতেই হয়ে গেল। সব মিলিয়ে হয় তো দেড় দুশো টাকা খরচ। আর তাতেই মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার মতন যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আইডিয়াটা কেমন? ব্রিলিয়ান্ট না?"

আরেকটু হলে নিতাই নস্করের মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, "ঘোড়ার ডিম আর হাতির শিং।" কোনো রকমে সামলে নিয়ে বলেন, "হেঁ, হেঁ। তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"প্রবলেম হল, আপনার মতন মূর্খ ঘাটবাবুরা ইলেক্ট্রিক চুল্লির দিকে আমাকে ঘেঁসতে দেয় না। তার ওপরে সারাক্ষণ শ্মশানঘাটগুলোতে মাছির মতন লোক কিলবিল

করছে। এক্সপেরিমেন্টের জন্যে যে নির্জনতা দরকার সেটা পাওয়াই অসম্ভব। এর আগে মাত্র তিনবার খারাপ চুল্লির দখল নিতে পেরেছিলাম। তাতে কিছুটা শিখেছি। ভুল ত্রুটিগুলো অনেকটাই শুধরে নিয়েছি। দেখা যাক এবারে কী হয়।"— এই বলে ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র তাঁর হাতের সেই মুগুরের মতন দেখতে স্প্যানারটা দিয়ে এক ঝটকায় লোহার শাটারটা খুলে চুল্লির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে নিতাইবাবু ভাবতে থাকলেন, কত রকমেরই যে পাগল হয়। বেশিরভাগ পাগলেরই অবশ্য এই দোষটা থাকে। তারা যা নয়, নিজেদের তাই ভাবে। যেমন তাদের পাড়ার হাপু পাগলা নিজেকে ভাবত উত্তম কুমার। দু হাতে দুটো ডাবের খোলা নিয়ে হাপু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গান গাইত আর ডায়ালগ মারত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কখনো গাড়ি চাপা পড়েনি। বোঝাই যাচ্ছে, চুল্লি সারাই কোম্পানির এই ভদ্রলোকও সেইরকমই নিজেকে বিজ্ঞানী ভাবছেন। তা ভাবুন। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে মেশিনটাকে সারানো। ভদ্রলোক যেভাবে এক ঝটকায় শাটারটাকে খুলে ফেললেন, তাতে তো মনে হচ্ছে কাজটা ভালোই বোঝেন। তাহলে কিছুক্ষণ ওর তালে তাল দিয়ে গেলে ক্ষতি কী?

নিতাইবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, এই পৌষ মাসেও আকাশ কালো করে অসময়ের বৃষ্টি নেমেছে। মানুষ তো মানুষ কুকুরগুলো অবধি ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। একবার পকেটের মোবাইল ফোনটায় হাত ঠেকিয়েও আবার কি মনে করে তিনি হাতটা সরিয়ে

নিলেন। এখন কাউকে ফোন করাও রিস্কি। লাশ নিয়ে তার নিত্যদিনের কাজ ঠিকই, কিন্তু নিজে লাশ হয়ে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়।

মিনিট দশেক বাদেই ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র আবার হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হাতের যন্ত্রপাতি আর বোতলগুলো ব্যাক—প্যাকের মধ্যে ঢুকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ব্যস, কাজ শেষ। এবার লিভারটা টানুন দেখি।''

নিতাইবাবু ভালো ছেলের মতন লিভারটায় হ্যাঁচকা টান দিলেন। ঘড়ঘড় শব্দ করে শাটার বন্ধ হয়ে গেল। তার আগে নিতাইবাবু একপলক দেখতে পেলেন, কানকাটা মধুর বডিটা একইভাবে কাঠ হয়ে চুল্লির ভেতরে পড়ে আছে।

ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র নিজেই দেয়ালের গায়ে বসানো ফার্নেসের সুইচটায় চাপ দিলেন। নিতাই নস্কর অবাক হয়ে দেখলেন, আগুনের লাল নয়, অন্যরকম একটা ঘোর নীল রঙের আলো চুল্লির ফাঁক ফোকর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল। আগুনের গনগনে আঁচ নয়, বরং একটা হাড় কাঁপানো শীতল তরঙ্গ চুল্লির দেয়াল থেকে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এই প্রথম নিতাই নস্করের মনে একটা অন্যরকমের সন্দেহ উঁকি মারল। তিনি আরেকবার ভালো করে সিদ্ধকামের চোখদুটো দেখলেন। ওরকম জ্বলজ্বলে চোখ পাগলদের হয়, আবার প্রতিভাবানদেরও হয়। ইনি যা বলছেন তা কি সত্যি? ইনি কি সত্যিই ডুসেলডর্ফের

ডক্টরেট। সত্যিই কি উনি এইমাত্র কোনো যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শেষ করলেন?

কান ফাটানো আওয়াজ করে কাছাকাছি কোথাও একটা বাজ পড়ল। শীতে কিংবা ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপে উঠলেন নিতাইবাবু। আর তখনই মসৃণভাবে চুল্লির দরজাটা আবার খুলে গেল।

তিন

"আমাকে বাঁচালে কেন?"— তীক্ষ্ণ চিৎকারে শুধু নিতাইবাবু নন, ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র অবধি দু'পা পেছনে ছিটকে গেলেন।

"কেন বাঁচালে আমাকে?"— নীল আলোয় ভরা চুল্লির ভেতর থেকে আবার চিৎকার করে উঠল মধু মাফিয়া। চুল্লির মেঝেতে পাতা বাঁশের চালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে সে। খালি গা। কোমরে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। তার বুকে পেটে, এখানে ওখানে, মর্গের ডাক্তারবাবুর হাতে দেওয়া গুন চটের বস্তার মতন মোটা সেলাইয়ের দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মধু মাস্তান টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে সিদ্ধকামের মুখোমুখি দাঁড়াল। সিদ্ধকাম হাত তুলে তাকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করলেন— "আহা চটছেন কেন? লোকে তো বাঁচতেই চায়। আপনার নবজন্ম হল। এতে তো আপনার খুশিই হওয়া উচিত।"

"নিকুচি করেছে তোমার নবজন্মের। কোনোদিন নিজের চ্যালাচামুন্ডার হাতে মার খেয়েছ? একদিন যেখানে রাজার মতন বেঁচে ছিলে, সেখানে কোনো দিন ভিক্ষের ঝুলি

পেতেছ? তাহলে বুঝতে, ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।"

হঠাৎ এক হেঁচকা টানে সিদ্ধকামের হাত থেকে স্প্যানারটা কেড়ে নিয়ে দুমদাম এদিক ওদিক চালাতে শুরু করল কানকাটা মধু। মাথা বাঁচাবার জন্যে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন নিতাইবাবু আর ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র। সেখান থেকেই তারা ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে ভাঙচুরের আওয়াজ শুনলেন। একটু বাদেই ঝড়ের মতন তাদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মধু মাস্তান। নদীর বুকে একটা শব্দ হল, 'ঝপাং। নিতাইবাবু মুখের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জল মুছতে মুছতে মন্তব্য করলেন, "মধু তাহলে দ্বিতীয়বার সুইসাইড করল?"

ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র কোনো কথা না বলে আবার চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেছনে পেছনে নিতাই নস্কর। এখন আর সেটাকে চুল্লি না বলে চুল্লির ধ্বংসস্তূপ বলাই ভালো। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সিদ্ধকামের লাগানো ডায়োড, ট্রায়োড, সার্কিট, কেমিকেলের বোতল। প্রচণ্ড হতাশ স্বরে সিদ্ধকাম বললেন, "সব জলে গেল। এই প্রথমবার সাকসেস পেলাম, কিন্তু সাকসেসের ফর্মুলাটা টুকে রাখতে পারলাম না। কোথায় যে কী লাগিয়েছিলাম, কোন কেমিকেল কতটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কত ভোল্টেজ দিয়েছিলাম— কিছুই মনে করতে পারছি না। জানি না, কবে আবার এরকম পরীক্ষার সুযোগ পাব।"

নিতাইবাবু দেখলেন, ওই বিশাল চেহারার লোকটাও কেমন যেন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। মেঝে থেকে

ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে, ক্লান্ত পায়ে, বৃষ্টিধারায় ঝাপসা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেলেন কোথাকার কে ডক্টর সিদ্ধকাম মিত্র। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয় কিছুক্ষণের জন্যে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন নিতাইবাবু। তাঁর সম্বিৎ ফিরল পেছন থেকে মানুষের গলার আওয়াজে।— "দাদা, আমরা চুল্লি—কোম্পানি থেকে এসেছি। যা বৃষ্টি, এক ঘণ্টার রাস্তা আসতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। কই দেখি কী হয়েছে।"

তিনটে ছেলে নিজেরাই স্মার্টলি চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তাদের গলা থেকে সমবেত আর্তনাদ ভেসে এল— "একি! আপনি তো বলেছিলেন চুল্লি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এ তো দেখছি ভাঙচুর চালানো হয়েছে। মেশিনটার এরকম হাল হল কী করে?"

ওদের মধ্যে একজন একটু এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে বলল, "আপনি যে বলেছিলেন ভেতরে বডি আটকে রয়েছে। কোথায় বডি? কী ব্যাপার বলুন তো।"

মেঝেয় শুয়ে থাকা নিতাই নস্করের কাছ থেকে এ সব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না, কারণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে এতক্ষণে তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন, আর অজ্ঞান মানুষ কথা বলে না।

প্রেত উল্কি



এক

আমার কলেজের বন্ধু সাগ্নিকের ডাকে বিধনি গিয়েছিলাম। বেড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ সেখানে গিয়ে এক হাড় হিম করা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম।

পশ্চিমবঙ্গ আর ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে শান্ত শহর বিধনি। সাগ্নিক ওখানকার থানার ও সি। তিনবছর ধরেই আমাকে ফোনে ডাক পাঠাচ্ছে, "আমি ট্র্যান্সফার হয়ে যাওয়ার আগে একবার এখান থেকে ঘুরে যা পার্থ। হলফ করে বলতে পারি, এমন সুন্দর জায়গা কমই দেখেছিস।"

অতএব এবার ক্রিসমাসের ছুটিতে চলেই গেলাম বিধনি। ছোট্ট স্টেশনটা নামতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। লাল মোরামে ঢাকা প্লাটফর্মের ওপর বিশাল বিশাল কয়েকটা মহুয়া আর শালের গাছ। যতদূর চোখ যায়, শীতের রোদে ঝলমল করছে সবুজে ছাওয়া ছোটনাগপুরের মালভূমি। দিগন্তে মেঘের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে দলমা পাহাড়। সেই পাহাড়ের দিক থেকেই একটা হিমঠান্ডা হাওয়া এসে শরীরের সমস্ত জড়তা ঝরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাগ্নিক নিজেই জিপ নিয়ে চলে এসেছিল। জিপে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। তুই না ডাকলে এরকম স্বর্গের মতন জায়গাটা অদেখাই থেকে যেত।"

সাগ্নিককে যতটা খুশি দেখব ভেবেছিলাম, ততটা খুশি দেখাল না। মুখে যেন একটা দুশ্চিন্তার কালো ছাপ। জিপটা মেন রোডে তুলে বলল, "স্বর্গে ভূত ঢুকেছে।"

"মানে?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

সাগ্নিক বলল, "ঝাড়খণ্ডের টেররিস্টরা এখানে লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকে পড়ছে। গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকছে, অথচ তাদের ধরতে পারছি না। আমি পৌঁছনোর আগেই ব্যাটারা কেমন করে যেন খবর পেয়ে পিঠটান দিচ্ছে। যাগগে, ওসব কথা থাক। তুই এসেছিস, এখন কদিন শুধু তোকে নিয়ে বেড়াব।"

বিধনি থানার পেছনেই সাগ্নিকের ছবির মতন সুন্দর কোয়ার্টার। লাল টালিতে ছাওয়া একতলা বাংলোবাড়ি। চারিদিকে ফুলের বাগান। ওর হেল্পিং—হ্যান্ড মধুদার মতন

এত ভালো মানুষ দেখাই যায় না। আমি পৌঁছনো মাত্র আমাকে যে কীভাবে যত্ন করবেন তাই নিয়েই অস্থির হয়ে উঠলেন। যাই হোক, চানটান সেরে, মধুদার বানানো গরম গরম ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রেজালা দিয়ে লাঞ্চ সেরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম, সাগ্নিক গম্ভীর মুখে একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে। পাজামা পাঞ্জাবি ছেড়ে আবার ইউনিফর্ম, টুপি সব পরে নিয়েছে, এমনকী জুতোটাও।

অবাক হয়ে বললাম, "তুই কি আবার বেরোবি না কি?"

ও আমাকে পাশের বেতের চেয়ারটায় বসতে বলল। তারপর খুব দুঃখিত সুরে বলল, "পার্থ, আমার এত খারাপ লাগছে তোকে কেমন করে বোঝাব। কিছুক্ষণ আগেই একটা মার্ডারের খবর এল। একবার গিয়ে ইনভেস্টিগেট না করলেই নয়। জায়গাটা এখান থেকে একটু দূরও আছে। অবশ্য একজন হাবিলদারকে অলরেডি ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, ডেডবডি পাহারা দেওয়ার জন্যে। কাজেই আমি একটু দেরি করে বেরোলেও অসুবিধে নেই। কিন্তু তুই একা একা কী করবি?"

আমি বললাম, "এর জন্যে এত সঙ্কুচিত হচ্ছিস কেন? পুলিশের চাকরিতে এরকম তো হতেই পারে। একটা কাজ করি না। যদি অসুবিধে না থাকে, তাহলে আমিও তোর সঙ্গে ঘুরে আসি? একটু বেড়ানোও হবে, আর বলা যায় না, কলকাতায় আমার কাগজে পাঠানোর মতন একটা রোমহর্ষক খবরও পেয়ে যেতে পারি।"

সাগ্নিক খুব খুশি হয়ে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই সত্যি যাবি পার্থ? তাহলে তো খুব ভালো হয়। চল, আর দেরি করব না। যেতে যেতে তোকে কেসটা বলব।"

দুই

জিপ ড্রাইভ করতে করতে খুনের ঘটনাটা সম্বন্ধে সাগ্নিক আমাকে যা জানাল তা হল এই—

বিধনি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটা জঙ্গলে ঢাকা ছোট গ্রাম আছে, নাম সিরহুল। গ্রামের বাইরে নদী। নদীর নামও সিরহুল। নদীর ওপারে অনেকখানি কাশে ঢাকা প্রান্তর। সেই প্রান্তর গিয়ে মিশেছে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে। কাশবনের মধ্যে একটু পরিষ্কার জায়গায় একটা মাত্র কুঁড়েঘর। ওটাই ছিল শিবসাধুর আস্তানা।

শিবসাধুর বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হবে। সাধুদের মতনই জটা দাড়ি রক্তবস্ত্র সবই ছিল তার। সিরহুল আর তার আশপাশের গ্রামের লোকেরা জানত, শিবসাধুর নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ঝাঁড়ফুক, মারনউচাটন এসবে সে না কি সিদ্ধহস্ত। মুখে কেউ স্বীকার না করলেও, গ্রামের অনেকেই রাতের অন্ধকারে শিবসাধুর সঙ্গে দেখা করত। টাকাপয়সা দিয়ে শত্রুকে বাণ মারাত। নিজেদের ভাগ্যগণনাও করিয়ে আসত। সকলেই একটা কথা স্বীকার করত, শিবসাধু লোকটা ঈশ্বরের উপাসক ছিল না, ছিল শয়তানের সাধক।

মারণউচাটন ছাড়া শিবসাধুর আরেকটা গুণ ছিল— সে খুব ভালো উল্কি আঁকতে পারত। শুধু কালো বা নীল উল্কি নয়, নানারকম গাছের রসটস দিয়ে রঙিন উল্কি আঁকতেও সে ছিল ওস্তাদ। আদিবাসীদের উল্কিপ্রীতির কথা কে না জানে? তারা প্রায়ই শিবসাধুর কাছে গিয়ে পয়সা দিয়ে উল্কি আঁকিয়ে আনত।

সেই শিবসাধুই খুন হয়েছে। আজ সকালে গ্রামের কয়েকটা মেয়ে উল্কি আঁকাতে গিয়ে দেখে তার ঘরের দরজা খোলা, আর ঘরের মেঝেয় রক্তস্রোতের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে শিবসাধু।

আমি বললাম, "এরকম একজন মানুষকে কে খুন করল? কেনই বা করল? সাধুসন্ন্যাসীদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস তো সাধারণ গ্রামবাসীদের থাকে না। তার ওপরে যার অলৌকিক ক্ষমতার ওপরে তাদের এত বিশ্বাস ছিল।"

সাগ্নিক বলল, "ঠিকই বলেছিস। সাধারণ গ্রামবাসীরা শিবসাধুকে খুন করেনি। করেছে টেররিস্টরা।"

"টেররিস্টরা!" আমি অবাক হয়ে সাগ্নিকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। "টেররিস্টদের সঙ্গে নির্জন নদীর চরে বসবাসকারী এক সন্ন্যাসীর কী সম্পর্ক?"

সাগ্নিক বলল, "খবর পেয়েছি, রিসেন্টলি এরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। জানিস নিশ্চয়, সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দল উপদল রয়েছে। এক একটা দলের এক একরকম চিহ্ন বা লোগো। ওরা বুকে বা পিঠে সেই চিহ্ন উল্কি দিয়ে আঁকিয়ে নেয়, যাতে নিজের দলের

সদস্যকে চিনতে অসুবিধে না হয়। সেরকমই একটা নতুন গজিয়ে ওঠা দলের সদস্যরা শিবসাধুর কাছে উল্কি আঁকতে আসত।"

আমি বললাম, "কিন্তু তাতে তো শিবসাধুর সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বই গড়ে উঠার কথা। তাকে মারবে কেন?"

সাগ্নিক বলল, "সঠিক কারণটা এখনই বলতে পারব না। কিন্তু ধর যদি শিবসাধু ওদের কারুর পরিচয় জেনে ফেলে আর তারপর ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে। তখন খুন করা ছাড়া উপায় কী?"

আমি বললাম, "কিন্তু সাগ্নিক, শিবসাধু যদি ওদের কারুর পরিচয় জেনেই থাকত, তাতেই বা ক্ষতি কী ছিল? টেররিস্টরা তো থাকে জঙ্গলে। পরিচয় জানলে তো তাকে ধরতে পুলিশের বাড়তি কোনো সুবিধে হত না।"

"উঁহু, এটা তোর একেবারে ভুল ধারণা।", বলল সাগ্নিক। "ওরা অপারেশনের সময় ছাড়া অন্য সময় গ্রামবাসীদের মধ্যেই মিশে থাকে। এমনকী শুনলে অবাক হবি, বিভিন্ন সরকারি অফিসে, এমনকী পুলিশের মধ্যেও ওদের স্পাই মিশে রয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা, শিবসাধু সেরকমই কাউকে চিনতে পেরে গিয়েছিল। এমন কাউকে, যে খুব গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, খুব সাংঘাতিক সব ইনফর্মেশন নিয়মিত টেররিস্টদের হাতে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। শিবসাধু নিশ্চয় ওদের কাছে সেই পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর পয়সা চেয়েছিল। ওরা পয়সার বদলে শিবসাধুর মাথায় বুলেট পুরে দিয়েছে।"

তিন

কথা বলতে বলতে আমরা একটা ছোট গ্রাম পেরোলাম। বুঝলাম এটাই সেই সিরহুল গ্রাম। তারপর একটা নদী। শীতকাল বলে নদীতে জল কম ছিল। আমাদের জিপ দিব্যি নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে হেলতে দুলতে ওপারে পৌঁছল। তারপরেই দেখতে পেলাম শিবসাধুর ডেরা।

সাগ্নিক যেমন বলেছিল, কাশের জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার নিকোনো উঠোন। তার মাঝখানে ছোট একটা ঘর। আমাদের জিপ ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র খাঁকি পোশাক পরা এক হাবিলদার দৌড়ে এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এঁনাকেই সাগ্নিক লাশ পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। সাগ্নিক বলল, "জীবনবাবু। দরজাটা তালা দিয়ে রেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। একটু খুলে দিন। আমরা ভেতরটা দেখব।"

ঘরটায় ঢোকা মাত্র আমার সারা শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে গেল। সেটা শুধু মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা প্রাণহীন দেহটার জন্যে নয়। দেয়ালে টাঙানো হাড়, মড়ার মাথার খুলি, সাপের খোলস, নানারকমের ডমরু আর মাদলের মতন বাদ্যযন্ত্র—সেগুলোও অস্বস্তিটার জন্যে দায়ী।

সাগ্নিক উবু হয়ে বসে শিবসাধুর মাথার পেছন দিকটা দেখল। ওইখান থেকেই রক্ত গড়িয়ে এসে মেঝেতে পড়েছিল। সাধুর একটা হাত একটু তুলবার চেষ্টা করেই

কথা বলতে বলতে আমরা একটা ছোট গ্রাম পেরোলাম। বুঝলাম এটাই সেই সিরহুল গ্রাম। তারপর একটা নদী। শীতকাল বলে নদীতে জল কম ছিল। আমাদের জিপ দিব্যি নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে হেলতে দুলতে ওপারে পৌঁছল। তারপরেই দেখতে পেলাম শিবসাধুর ডেরা।

সাগ্নিক যেমন বলেছিল, কাশের জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার নিকোনো উঠোন। তার মাঝখানে ছোট একটা ঘর। আমাদের জিপ ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র খাঁকি পোশাক পরা এক হাবিলদার দৌড়ে এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এঁনাকেই সাগ্নিক লাশ পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। সাগ্নিক বলল, "জীবনবাবু। দরজাটা তালা দিয়ে রেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। একটু খুলে দিন। আমরা ভেতরটা দেখব।"

ঘরটায় ঢোকা মাত্র আমার সারা শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে গেল। সেটা শুধু মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা প্রাণহীন দেহটার জন্যে নয়। দেয়ালে টাঙানো হাড়, মড়ার মাথার খুলি, সাপের খোলস, নানারকমের ডমরু আর মাদলের মতন বাদ্যযন্ত্র— সেগুলোও অস্বস্তিটার জন্যে দায়ী।

সাগ্নিক উবু হয়ে বসে শিবসাধুর মাথার পেছন দিকটা দেখল। ওইখান থেকেই রক্ত গড়িয়ে এসে মেঝেতে পড়েছিল। সাধুর একটা হাত একটু তুলবার চেষ্টা করেই

সাগ্নিক আবার নামিয়ে দিল। বলল, "রাইগার মর্টিস সেট করে গেছে। মানে কাল রাত্তিরে খুন হয়েছে।"

তারপর মাথার পেছনের ইনজুরিটা ভালো করে দেখে বলল, "একটাই গুলি খরচা হয়েছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে তার বেশি লাগবেই বা কেন? কিন্তু..."

কথাটা শেষ না করেই সাগ্নিক কেমন যেন হতচকিত ভাব নিয়ে ঘরটার মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল।

আমি বললাম, "কী হল?"

"বুলেটের খোলটা তো এই ঘরেই পড়ে থাকবার কথা। সেটা কোথায় গেল?"

বুলেটের খোল পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না আরও অনেক কিছুই। কোনো পায়ের ছাপ নেই, ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই। কারা যেন খুন হওয়ার পর যত্ন করে সে সব মুছে ফেলেছে।

ভুরু কুঁচকে গেল সাগ্নিকের। বলল, "এটা কেমন হল! তার মানে কি সকালে যে মেয়েগুলো মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল তাদের মধ্যেই টেররিস্টদের লোক লুকিয়ে ছিল? ভালো করে দেখতে হবে তো ব্যাপারটা।"

শিবসাধুর হাতের কাছে কটা জিনিস পড়ে ছিল। সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে সাগ্নিক বলল, "এই দ্যাখ পার্থ। ট্যাটু করার, মানে উল্কি আঁকার সাজসরঞ্জাম। ছুঁচ, রং, তুলো আরও কীসব যেন। তার মানে শিবসাধু যখন ট্যাটু আঁকার প্রস্তুতি নিতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তখনই তাকে খুন করা হয়েছে। আরে, এটা কী?"

ট্যাটুর ব্যাগ থেকে একটা ট্রেসিং—পেপারের মতন কাগজ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সাগ্নিক। টর্চের আলোয় কাগজটাকে মেলে ধরে বলল, "পার্থ, দ্যাখ এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। ট্রেসিং—পেপারের ওপর কাঁকড়াবিছের নকশা। এই ট্রেসিং—পেপার থেকে চামড়ার ওপর ছাপ তুলে ট্যাটু আঁকা হয়। তার মানে কি নতুন টেরস্টিদলের লোগো হচ্ছে কাঁকড়াবিছে? কে? কে ওখানে?"

দরজার কাছ থেকে একটা ছায়া সরে যেতে গিয়েও সাগ্নিকের চিৎকারে আবার এগিয়ে এল। ছায়ার পেছনে মানুষটাকেও দেখা গেল। অন্য কেউ নয়, হাবিলদার জীবনবাবু।

"উঁকি মারছিলেন কেন? কিছু বলার থাকলে ভেতরে আসবেন তো।"

"না স্যার। মানে আবহাওয়াটা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আমাদের এবার রওনা হলে ভালো হত। ওই নদীতে যদি হড়পা বান আসে, তাহলে আমরা জিপ নিয়ে পেরোতে পারব না।"

জীবনবাবুর কথাটা সত্যি। হঠাৎই অসময়ের বৃষ্টি নেমেছে। সন্ধের আবছা আলোয় নদীর দিকে চেয়ে মনে হল, জল ইতিমধ্যেই অনেকটা বেড়ে গেছে। সাগ্নিক বলল, "তাহলে একটা কাজ করুন। ঘরটা আর তালা দেওয়ার দরকার নেই। আপনি দরজায় গার্ড দিন। আমি আর এই সাহেব সিরহুল থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে

আসছি। তারা আপনার সঙ্গে ধরাধরি করে বডিটা জিপের পেছনে তুলে দেবে।"

জীবনবাবুকে পাহারায় রেখে আমরা জিপ নিয়ে নদী পেরোলাম। যখন প্রায় সিরহুল গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে গেছি, তখনই হঠাৎ শিবসাধুর ডেরার দিক থেকে মানুষের গলার তীক্ষ্ন আর্তনাদ ভেসে এল। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে জিপটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সাগ্নিক আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কিছু শুনলি পার্থ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। কে যেন চিৎকার করে উঠল।"

"তাহলে ঠিকই শুনেছি। জীবনবাবুকে কেউ অ্যাটাক করল না কি?"— বালি কাদার ওপরেই জিপটাকে ইউ—টার্ন করিয়ে সাগ্নিক শিবসাধুর আস্তানার দিকে ফিরে চলল। রাস্তা পেছল, স্পিড তোলা যাচ্ছিল না। শিবসাধুর আস্তানা অবধি ফিরে যেতে আমাদের অনেকটাই সময় লাগল।

ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে গেছে। বৃষ্টির জোরও বেড়েছে। জিপ থেকে নেমে আমরা দুজনে দুটো চার সেলের টর্চ জ্বালিয়ে শিবসাধুর ঘরের দিকে পা চালালাম। সামনে সাগ্নিক। আমি পেছনে। সাগ্নিকের হাতে টর্চ ছাড়াও একটা রিভলবার। কিছুক্ষণবাদে শিবসাধুর ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমরা একসঙ্গেই ঘরের মেঝের দিকে টর্চের আলো ফেললাম।

চার

সেখানে এখন শিবসাধুর মৃতদেহ পড়ে নেই। তার বদলে অন্য একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃত মানুষটার চোখদুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত, খাঁকি উর্দিটাও ছিঁড়ে ফালা

ফালা হয়ে গেছে। তবু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। হাবিলদার জীবনবাবু।

আমরা আরও দু'পা এগিয়ে গেলাম। জীবনবাবুর বুকের ওপর একটা পুরনো উল্কি— কাঁকড়াবিছের। তার নিচে আরও একটা নাম, একটা গ্রামের। সুঁচের টাটকা ফোঁড়গুলো থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে।

সাগ্নিক সেইদিক থেকে চোখ না সরিয়েই ফিসফিস করে বলল, "তার মানে জীবনবাবু একজন বিশ্বাসঘাতক! টেররিস্ট। আমাদের মধ্যে মিশেছিলেন। এর আগে যখন শিবসাধুর কাছে কাঁকড়াবিছের উল্কি আঁকাতে এসেছিলেন তখন শিবসাধু ওঁনাকে চিনে ফেলেছিল। ওঁনার জন্যেই শিবসাধুকে খুন হতে হয়েছে।

"বুঝলি পার্থ, এখন মনে পড়ছে, আজ সকালে লাশ পাহারা দেওয়ার ডিউটি—টা জীবনবাবু একরকম জোর করেই আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছিস তো? সমস্ত এভিডেন্স লোপাট করা।

"তবু ট্রেসিং—পেপারটা ওঁনার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন ওঁটাকে সরাবার জন্যে ঘরে ঢুকেছিলেন। আর ঘরে ঢুকতেই ..."

আমি বললাম, "ঘরে ঢোকার পর কে ওঁনাকে মারল সাগ্নিক? ওঁনার বুকের ওপর নতুন করে উল্কিতে লেখা ওই নামধামগুলোই বা কাদের?"

"বুঝতে পারছিস না? নামগুলো ওঁনার দলের বাকি টেররিস্টদের। শুধু নাম নয়, এই মুহূর্তে ওরা যেখানে

লুকিয়ে আছে, সেই গ্রামের নামও উল্কি দিয়ে লিখে রেখে গেছে। আমার কাজ শুধু ওদের ধরা।''

''কিন্তু কে? কে লিখে রেখে গেছে? কে খুন করল জীবনবাবুকে? শিবসাধুর লাশটাই বা কোথায় গেল?''

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সাগ্নিক বাইরে বেরিয়ে এল। পেছন পেছন আমি। সাগ্নিক ওর টর্চের আলোটা উঠোনের ওপর ফেলল। দেখলাম কাদার ওপর দিয়ে দুটো টাটকা পায়ের ছাপ ঘরের পেছনদিকে চলে গেছে। আমরা ছাপগুলোকে অনুসরণ করে সেদিকে গেলাম। জ্বলন্ত টর্চটাকে তুলে ধরে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাতেই চোখে পড়ল সেই অভাবনীয় দৃশ্য— অনেক দূরে একটা মানুষের মূর্তি টলতে টলতে কাশবন ভেঙে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল তার মুখ জটা দাড়িতে ঢাকা। বৃষ্টির জলে গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে গাঢ় রঙের ধুতি আর চাদর।

মাথার পেছনের বুলেটের ক্ষতটা অবশ্য এতদূর থেকে দেখা সম্ভব নয়।

টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে সাগ্নিক বলল, যে মৃতদেহ উঠে দাঁড়ায়, খুন করে, উল্কি এঁকে চলে যায়, তাকে কি আর লাশ বলা যায় পার্থ? না, লাশ নয়। শিবসাধু এখন পিশাচ।''

রাতের নৌকা



দরজা ভেঙে তান্ত্রিক দুর্লভ চক্রবর্তীর ঘরে ঢোকার পর ভজন বাউড়ি প্রথমেই ওঁর চোখ দুটো জম্পেশ করে একটা গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল।

তখন রাত দু'প্রহর। রাস্তার কুকুর, গাছের পাখি, এমনকী আহিরন—বিলের জলের ঢেউগুলো অবধি যেন কুয়াশার চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুর্লভ তান্ত্রিকও তার বিলের ধারে বানিয়ে তোলা কালীমন্দিরের দোর এঁটে ঘুমোচ্ছিলেন।

মন্দিরের নকশা ততদিনে ভজনের মুখস্থ। গত একমাসের মধ্যে ভজন তিন—তিনবার ভক্ত সেজে এসে সবকিছু মেপেঝুপে গিয়েছে। পাকা মন্দির নয়, কাঁচা ঘর। টালির চাল, দরমার দেয়াল, মাটির মেঝে। দরজার ঠিক

মুখোমুখি কষ্টিপাথরের চামুণ্ডা মূর্তি। হাত দুয়েক উঁচু। দেখলে ভয় লাগে। ঘরে কোনো জানলা নেই।

মেঝের একপাশে যে একপ্রস্থ চাটাই, বালিশ আর কাঁথা গুঁটিয়ে রাখা আছে সেটা ভজনের চোখ এড়ায়নি। সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল— ঠাকুরমশাই তাহলে এই ঘরেই রাতে ঘুমোন। এবং যেহেতু আর কোনো বিছানাপত্তর ছিল না, কাজেই ভজন বুঝে নিয়েছিল, তিনি একাই ঘুমোন।

তখনই ভজন দেবীর গয়না—লুঠের মতলবটা পাকা করেছিল।

না, একটু ভুল বলা হল। অত চট করে কোনো ডাকাতির মতলব পাকা করা যায় না। যার ঘরে ডাকাতি করতে ঢুকছ, তার কমজোরিগুলো যেমন জানতে হয়, তেমনি তার জোরের জায়গাগুলো চোখ এড়িয়ে গেলেও ভুগতে হয়। এই যে, একসময়ের গোটা বহরমপুর পরগনার আতঙ্ক ভজন বাউড়ি, যার দলে ত্রিশজন যমদূতের মতন চ্যালা ছিল— যে মশাল জ্বালিয়ে, রণপায়ে চড়ে, হা—রে—রে করে ডাকাতি করতে বেরোলে কোম্পানির সেপাইরা মানে—মানে রাস্তা ছেড়ে সরে পড়ত— সেই ভজন বাউড়িই যে আজ একেবারে একলা হয়ে পড়েছে, তার পেছনেও তো ওই একদিনের একটু অসাবধানতা।

দিনটা ছিল চারবছর আগের মাঘী—পূর্ণিমার রাত। তার পরের দিন রাধাসায়রের জমিদার হরেকৃষ্ণ বাগচির মেয়ের বিয়ে। খোঁজখবর পাক্কা। কলকাতা থেকে একলাখ টাকার গয়না জমিদারবাড়ির তবিলখানার সিন্দুকে সেইদিনই এসে

জমা হয়েছে। মাত্র তিনজন লাঠিধারী সিপাই সারারাত সেই তবিলখানা পাহারা দেবে। সব খবর নিয়েই ভজন বাউড়ি আর তার দলবল রাধাসায়রের জমিদারবাড়িতে হানা দিয়েছিল।

লাঠিধারী সিপাইয়ের খবরটা ভজন ঠিকই শুনেছিল। যে খবরটা জানতে পারেনি সেটা হল, মেয়ের বিয়েতে যে আমোদ—অনুষ্ঠান হবে, তাতে কসরত দেখানোর জন্যে জমিদারবাবু ভুবনডাঙা থেকে রায়বেঁশে নাচের দল ভাড়া করে এনেছেন। আর সেই চল্লিশজন নাচিয়ের দল বাড়ির পেছনে একটা চালাঘরে ডেরা বেঁধেছে।

ভুবনডাঙার রায়বেঁশে নাচের দলের লোকেরা লাঠি, সড়কি কিংবা ছুরিখেলা—টা ভজনের দলের লোকেদের থেকে কিছু কম জানত না। যে জমিদারবাবুর নুন তারা খেয়েছে তার বাড়িতে ডাকাতি হবে আর তারা বসে বসে দেখবে এও তাদের ধর্মে লেখে না। ফলে যা হবার তাই হল। ভজনের দলের বারোজন লোক সেই রাতেই রায়বেঁশের দলের হাতে খুন হয়ে গেল। ভজন নিজেও একটুর জন্যে খুন হতে হতে বেঁচে গেল, তবে তার ডান—পায়ের গোছে এমন একখানা সড়কি এসে বিঁধল যে, ইংরেজদের জেলখানার ডাক্তারবাবুকেও সেই ঘা সারিয়ে তুলতে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছিল। এখনও, জেলখানা থেকে বেরোনোর পরেও, ভজন ভালো করে দৌড়তে পারে না। একটু লেংচে হাঁটে। দল বেঁধে ডাকাতির কাজে তার ওইখানেই ইতি।

সেইজন্যে এবার প্রথমদিনেই মন্দির—ফেরত একটা বোকাসোকা মতন লোকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভজন কথাটা আলতো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিল— এই যে দুর্লভঠাকুর মায়ের এত গয়নাগাটি নিয়ে বিলের ধারে একলা থাকেন, তা ভয়ের কিছু নেই এতে?

গেঁয়ো লোকটা এই কথা শুনে চলা থামিয়ে হাঁ করে কিছুক্ষণ ভজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, দুর্লভঠাকুরের ঘরে ডাকাতি! ডাকাতের নাকের ওপর দুটো চোখ থাকবে তো?

ভজন ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না পেরে নিজের চোখদুটোয় একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, ধরো তা তো থাকবেই। চোখ না থাকলে ডাকাতিটা করবে কেমন করে?

তাহলেই হল। লোকটা আবার মাঠ পেরিয়ে চলা শুরু করল। চলতে চলতেই বলল, একবার দুর্লভ ঠাকুরের চোখে চোখ পড়ে গেলে তাকে আর নড়ে বসতে হবে না। দলবল সমেত তাকে ওইখানেই থম হয়ে বসে থাকতে হবে। আর আহিরন থানার বড়বাবু চার্লিসাহেব পরে সময়মতন এসে তাদেরকে টুকটুক করে কাঁকড়ার মতন ঝাঁকায় পুরে লে যাবে।

ভজনের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল— সেদিন মন্দিরে যাতায়াতের পথে ভক্তদের মুখে এমনধারা কথাই সে সারাক্ষণ শুনেছে বটে। সম্মোহনের কথা। দুর্লভঠাকুর নাকি মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে সম্মোহন করে দিতে পারেন।

যতক্ষণ তিনি নিজে থেকে কাটান না দিচ্ছেন, ততক্ষণ সম্মোহিত লোকটার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না।

তবে হ্যাঁ, যে কোনো গুণী মানুষের মতন দুর্লভ চক্রবর্তী তাঁর ওই গুণটা যেখানে—সেখানে যখন—তখন দেখান না। একমাত্র পাগল রোগীকে ভালো করতে হলে তিনি তাদের সম্মোহন করেন, আর কখনো সখনো কারুর স্মৃতিলোপ পেলে সেই হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে।

কপালজোরে দুর্লভ তান্ত্রিকের সম্মোহন শক্তির একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ ভজন ঠিক পরদিনই পেয়ে গেল। বাপরে বাপ, একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হল কী, ঠাকুরের একটা ছোট ডিঙি—নৌকা আহিরন বিলের ঘাটে বাঁধা থাকে। যারা বিলের ধারে ঘরবসত করে, তাদের একটা নৌকা ছাড়া চলে না। কারণ, নামে বিল হলেও আহিরন আসলে সমুদ্রের মতন বিশাল একখানা ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ষাকালে তার এপার ওপার দেখা যায় না। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যাতায়াত করতে গেলে এদিকের লোকেরা তাই ট্যাঙস ট্যাঙস করে না হেঁটে, সড়াৎ সড়াৎ করে ডিঙি বেয়ে জলের ওপর দিয়ে চলে যায়। তাছাড়া পদ্ম কিংবা পানিফল তুলতে, ঘর ছাইবার হোগলা আনতে, আরও চৌষট্টিরকমের কাজে বিলের বুকে ভেসে পড়তেই হয়। ডিঙি ছাড়া চলবে কেমন করে?

হ্যাঁ, দুর্লভ ঠাকুরের সেই ডিঙি—নৌকাটা ভজনও যেতে—আসতে দেখেছে। দিব্যি গাবের আঠার পালিশ লাগানো কালো কুচকুচে একখানা নৌকা। গলুইয়ের দুপাশে আবার তেল—সিঁদুর দিয়ে টানা—টানা দুখানি

চোখ এঁকে দিয়েছে দুর্লভ তান্ত্রিক। সেই নৌকাটাকেই নাকি খুঁটির বাঁধন থেকে খুলে নিয়ে চারটে বদমাশ ছেলে বিলের জলে ভেসে গিয়েছিল। দুর্লভ তান্ত্রিক খবর পেয়ে বিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে ছেলে চারটে ফিরে এসেছে। খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ভজন বাউড়ি — ঠাকুরমশাইয়ের চোখদুটো কেমন যেন জ্বলে উঠল। তিনি একবার হাওয়ায় হাতটা ঘুরিয়ে বলল, তোরা ওইখানেই বসে থাক।

ব্যস, চারটে জোয়ান ছেলে একেবারে চারটে শামুকের মতন গুটিয়ে গেল; থম মেরে বসে রইল গাছতলায়। ভজন ইচ্ছে করেই দুয়েকবার গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। তোমাদের নাম কী? গ্রাম কোথায়? — এমনধারা কথা সব। ছেলেগুলো যেন সেসব শুনতেই পেল না। ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল। শেষকালে পুজোপাট সেরে দুর্লভঠাকুর ঘণ্টাদুয়েক বাদে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার ওদের চোখের সামনে হাতটাকে ঢেউয়ের মতন দু—চারবার নাড়াচাড়া করলেন। তখন ওদের সাড় ফিরল। তারপর ছেলেগুলোর মাঠঘাট ভেঙে পাঁইপাঁই করে দৌড় দেখে কে?

তখনই ভজন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মনে মনে বলেছিল, বাপস। ঠাকুরের চোখের দিকে চাওয়া নেই। এ যা বিপজ্জনক বিদ্যে, মুহূর্তের মধ্যে পাথর করে দেবে।

ভজন বুঝেছিল ওই সম্মোহনের ব্যাপারটুকু সামলে দিতে পারলে আর বিশেষ কোনো চিন্তার কারণ নেই।

লড়াইটা একজনের বিরুদ্ধে একজনের। তার ওপর দুর্লভ ঠাকুরের সরু বাঁশের মতন টিঙটিঙে চেহারা, আর তার নিজের ডান পা—টা খোঁড়া হলেও চেহারাটা এখনও মা দুর্গার অসুরের মতন তাগড়াই। অসুবিধে ছিল শুধু দুটো জায়গায়। এক, ওই সম্মোহন। আর দুই, দেবীর গায়ের গয়নাগুলো দুর্লভঠাকুর কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সেটা ওঁকে দিয়ে কবুল করানো। সেই দুটো কাজ কীভাবে একসাথে সারা যায় সে ব্যাপারে মনে মনে ছক কষেই এগিয়েছিল ভজন।

ঘরের ভেতর থেকে শক্ত শালকাঠের খিল লাগানো ছিল। ভজন বাউড়ির লোহার নেহাইয়ের মতন শক্ত কাঁধের তিন ধাক্কায় সেই খিল মড়মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ে গেল। তান্ত্রিক দুর্লভ চক্রবর্তী সেই সময়টুকুর মধ্যে তক্তাপোশের ওপর উঠে বসবার সুযোগটুকুই পেয়েছিলেন, তার বেশি কিছু নয়। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই গুলবাঘার মতন লাফ মেরে ঘরে ঢুকে ভজন বাঁ—হাতে ঠাকুরমশাইয়ের ঘাড় ধরে তাঁকে বিছানার ওপর উপুড় করে ফেলেছিল।

সে সময়টুকুতেও সে হুঁশিয়ার ছিল, ওঁর চোখে যেন চোখ না পড়ে যায়।

বিছানায় মুখ ঠেসে ধরে কাউকে তো বলা যায় না, এবার বলো দিকিনি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ দেবী চামুণ্ডার জড়োয়ার গয়না, যে গয়না সবেমাত্র গতমাসেই রাধাসায়রের জমিদারমশাই দেবীর কাছে মানত হিসেবে দিয়েছেন। কাজেই ভজন আগে ভালো করে দুর্লভ

ঠাকুরের চোখের ওপর দিয়ে গামছার ফেট্টি জড়াল। তারপর তাঁর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর ঠাকুরমশাইকে তক্তাপোশের ওপর বসিয়ে, গলার ওপর রামদা খানা ঠেকিয়ে, ভজন হিসহিস করে সেই প্রশ্নটা করে ফেলল—

গয়নাগুলো কোথায় লুকিয়েছেন?

অমন ডাকসাইটে তান্ত্রিককেও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিতান্তই এলেবেলে লাগছিল। তিনি মিনমিন করে বলে ফেললেন, শিবঠাকুরের মাথার নিচে পাথরের ফোকরে।

সত্যিই ফোকরের মধ্যে হাত গলিয়ে গয়না পেয়ে গেল ভজন। বেশি কিছু নয়, একটা হার, একটা তাবিজ আর দুটো বালা। তবে সবকটাই ওজনে ভারী। এগুলো বিক্রি করলে তার বছরখানেকের ভাত—কাপড়ের ভাবনা থাকবে না। ভজন কাজ সেরে বেরিয়েই আসছিল। হঠাৎ দুর্লভ তান্ত্রিক সেই মারাত্মক ভুলটা করে ফেললেন। বলে বসলেন, তোমার মুখটা দেখবার সুযোগ পাইনি। তবে তোমার একটা পায়ের জোর নেই। তুমি পা টেনে টেনে হাঁটছ। চোখ বেঁধে রাখলেও সেটা আমি কানে শুনে টের পাচ্ছি। এই কথাটুকু আমি দারোগা চার্লিসাহেবকে বলব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও কথাটা শুনে পাথর হয়ে গেল ভজন। তারপর মনে মনে মা চামুণ্ডাকে একটা প্রণাম করল। মা, ভাগ্যিস অহঙ্কারী লোকটার মুখ দিয়ে কথাটা বলালি! না হলে আমি তো বুঝতেই পারতাম না, ও আমার খোঁড়া পায়ের কথা জেনে ফেলেছে। খোঁড়া গুন্ডা একটা পরগনায় আর কটা থাকে? কাজেই কাল

ভোরেই চার্লিসাহেব আমাকে ঘর থেকে তুলে এনে পিটিয়ে আধমরা করে ডাকাতির কথা বার করে নিত।

এরপর আর দেরি করেনি ভজন। চোখ বাঁধা দুর্লভের গলায় রামদার এক কোপ ঝেড়ে বলেছিল, যা, এবার বলগে যা কাকে বলবি খোঁড়া পায়ের কথা।

না, তা বলবার সুযোগ পাননি দুর্লভ চক্রবর্তী। তবে মরবার আগে ঘরঘরে গলায় অন্য একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমার চোখের নজর থেকে তুমি বাঁচবে না। আমার চোখের নজর...থেকে...বাঁচবে না।

যতসব বাজে কথা। মরার আগের প্রলাপ।

মন্দির থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এপাশ ওপাশ তাকাল ভজন। সবকিছু যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। সেই কুয়াশায় ঢাকা আঁধার দুনিয়া। গাছের পাতা থেকে টুপিয়ে পড়া শিশিরের টপটপ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই কোনোখানে। ভজনের চোখে অন্ধকার সয়ে এলে সে হাঁটা লাগাল আহিরন বিলের দিকে।

আসবার পথে হেঁটে এসেছে। তাতে সময় লেগেছে অনেক। কষ্টও হয়েছে কম নয়। তবে ফেরার পথে সে আর হাঁটবে না।

কয়েক পলকের মধ্যেই ভজন মন্দিরের পেছনের শুঁড়িপথ ধরে আহিরন বিলের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। একটু দূরে ওই রাঙচিতের ঝোপটার আড়ালেই দুর্লভ হালদারের ডিঙি নৌকা বাঁধা রয়েছে। একবার সেটাকে শুধু খুঁটি থেকে খুলে নেওয়ার অপেক্ষা। ভোর হওয়ার

আগেই সোজা উত্তরপূর্ব কোণের দিকে লগি ঠেলে সে পৌঁছে যাবে লালবাগের ঘাটে। তারপর লালবাগের চোরাই সোনার কারবারি হুজুরিমলের হাতে গয়নাগুলো ধরিয়ে দিলেই সে নিশ্চিন্ত।

একবার পেটকোঁচড়ে বাঁধা গয়নাগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল ভজন। তার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। সে পায়ে পায়ে ঝোপটার দিকে এগলো।

জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভজন দেখল, বিলের বুকে চাপ চাপ কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কেমন করে কে জানে কুয়াশার গায়ে সাদাটে এক আলো লেগে রয়েছে। দণ্ডে দণ্ডে সেই কুয়াশার স্তূপ তাদের আকার বদলাচ্ছে। সাপের মতন মোচড় খাচ্ছে, বাঘের মতন গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। এই মনে হচ্ছে একটা মানুষ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে, আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে চারটে লোক মড়ার খাটিয়া কাঁধে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

বিলের বুকে দপদপ করে আলেয়া জ্বলছে নিভছে। হোগলার বনের মধ্যে দিয়ে বাতাস বওয়ার শব্দ হচ্ছে খট—খট, সড়—সড়।

মোদ্দা কথা, বিলের ধারে এসে পৌঁছতেই ভজনের মনে হল মন্দির চত্বরের সেই নির্জনতা এখানে আর নেই। এখানে আর সে একা নয়। চারিদিকে কারা যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ভজন একবার রামদার ওপরে হাতটা বুলিয়ে নিল। লোহা ছুঁয়ে থাকলে তেনাদের আসার কথা নয়। কী যেন

এক রাতচরা পাখি হঠাৎ ভজনের একেবারে কানের কাছে তীকষ্ন গলায় চিৎকার করে উঠল, কিয়ো কিয়ো কিকোরেএএ। ভজনের বুকটা কেঁপে উঠল। কেন এমন হচ্ছে আজ? ওই পাখিটার মতন, শিয়ালের মতন, সেও তো চিরকালের এক নিশাচর জীব। অন্ধকারকে তো সে এর আগে কখনও ভয় পায়নি। আজ তাহলে বুকের ভেতর এত ধুকপুকুনি কীসের?

রাঙচিতের ঝোপটাকে বেড় দিয়ে নৌকার কাছে পৌঁছতেই ভজনের বুকের ভেতর দিয়ে হিম ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

দুটো চোখ!

দুটো চোখ অন্ধকারের মধ্যে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে!

টানা টান বিশাল দুটো চোখ। কাজলকালো জোড়াভুরু ধনুকের মতন বাঁক খেয়ে গেছে। ওপরের আর নিচের ঘন আঁখিপল্লবের প্রান্ত বরাবর রক্তরেখা। একটু খয়েরি মণিদুটো কী ভীষণ জীবন্ত!

সেই চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ভজন বাউড়ির সবকিছু বিস্মরণ হয়ে গেল। সে ভুলে গেল তার নাম ভজন বাউড়ি, সে আজ একটু আগে একটা মানুষ খুন করেছে। সে ভুলে গেল তাকে পালাতে হবে, আর তার জন্যে তাকে নৌকা ধরতে হবে এখান থেকেই। সে ভুলে গেল কাকে বলে পৃথিবী, কাকে বলে আকাশ, কাকে বলে দিন, কাকে বলে রাত্রি।

ভজনের সমস্ত চেতনা জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল টকটকে লাল তেলসিঁদুরের কাজল—টানা দুটো চোখ। একটু খয়েরি দুটো মণি দুটো গভীর কুঁয়োর মতন তাকে ডাক দিল— আয় ভজন, কাছে আয়! আয়!

সেই শব্দহীন ডাকে সাড়া দিয়ে ভজন বিলের জলে এক পা ফেল। তারপর আরেক পা। তারপর আরেক পা।

বিলের পাড়ে একটা মরাগাছের ডালে বসে রাতচরা পাখিটা আতঙ্কিত চোখে সেই দৃশ্য দেখল। তারপর হঠাৎ হাহাকার করে উঠল—গেল, গেল, গেলরেএএএ। তারপর পাখিটা তিরবেগে বিলের অন্যদিকে উড়ে পালাল।

ভজনের কানে অবশ্য এসব কিছুই ঢুকছিল না। তখন সে গভীর সম্মোহনে সম্মোহিত। তার সামনে তখন দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে দুটো দীর্ঘ চোখ আর ভজন আকুল হয়ে দুহাত বাড়িয়ে সেই চোখদুটোর কাছে পৌঁছনোর জন্যে জল ভেঙে হেঁটে চলেছে।

আহিরন বিলের ঘন কালো জল প্রথমে ভজনের কোমর ছুঁল। তারপর বুক। রাশি রাশি ঝাঁঝি আর শাপলার দল ভজনের দুই পায়ের গোছ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

ভজনকে ঘিরে শেষবারের মতন এক আলেয়ার মালা দপ করে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল।

জল ভজনের গলা ছুঁল। ভজন মাথা তুলে দেখল, তার প্রায় হাতের কাছে স্থির হয়ে ভেসে আছে সেই দুটো চোখ। তারা ভজনকে ডাকছে, আয় ভজন! আর একটু এগিয়ে আয়!

ভজন এগল। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। আহিরনের কালো জল ভজনের মাথার ওপরে একবার বুড়বুড়ি কেটেই স্থির হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বিলের ধারের বাসিন্দারা ভজনের ভেসে ওঠা মৃতদেহটাকে টেনে পাড়ে এনে তুলেছিল। তার পেটকোঁচড়ে মা—কালীর গয়না আর মন্দিরের মধ্যে দুর্লভঠাকুরের লাশ দেখে কারুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি আগের রাতে কী হয়েছিল।

তারা দুর্লভ ঠাকুরের ভেসে যাওয়া নৌকাটাকেও আবার টেনে এনে পাড়ের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল। কেমন করে নৌকাটার বাঁধন—দড়ি খুলে গিয়েছিল কে জানে!

তখনও নৌকাটার গলুইয়ের দুপাশে তেলসিঁদুর দিয়ে আঁকা সেই চোখদুটো নিষ্পলক তাকিয়েছিল।

তবে সেই চোখদুটোতে তখন আর আগের রাতের সম্মোহন ছিল না।

সেই নদীটার নাম



এক

আই—টি সেক্টরের সৌগত সেনগুপ্ত দিনের মধ্যে দশ—ঘণ্টা অফিস নিয়ে খুব চাপে থাকে, আর সেইজন্যেই যদি কখনও উইক—এন্ডে তিন চার দিনের ছুটি পায়, পালিয়ে আসে এই কুসুমপুরের মতন কোনো নিরিবিলি ফরেস্ট বাংলোয়। বনের সবুজ আলো আর তাজা হাওয়ায় তার চোখ—মন—মগজের ওপর জমে থাকা মরচেগুলো যখন ধুয়ে সাফ হয়ে যায়, তখন সে আবার নতুন উদ্যমে ফিরে যায় সল্টলেকে সেক্টর ফাইভের ছোট্ট খুপরিটায়।

খড়্গপুর থেকে লোধাশুলি হয়ে যে রাস্তাটা গোপিবল্লভপুরের দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তারই

ডানদিকে, পিচ—রাস্তা থেকে তিন—চার কিলোমিটার ভিতরে কুসুমপুরের বন।

কুসুমপুর খুব একটা বড় জঙ্গল নয়। বনের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝেমধ্যেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সৌগতর চোখে পড়েছে চাষের খেত আর মানুষের ঘরবাড়ি। তার খারাপ লাগেনি। কেন খারাপ লাগবে? ঝকঝকে তকতকে আদিবাসী গ্রামগুলোও কি কম সুন্দর নাকি? আর পূর্ণিমার রাতে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা 'দ্রিদিম দ্রিদিম' মাতলের বোল— যেন বনদেবতার হৃদপিণ্ডের লাবডুব। সেই অলৌকিক শব্দও কি সে শুনতে পেত, বনের পাশে গ্রাম না থাকলে? গত তিনদিন কুসুমপুরের ফরেস্ট বাংলোর বিছানায়, অনেক রাত অবধি ওই মাদলের শব্দে জেগে থেকেছে সৌগত।

গত তিনদিনে সৌগত একটাও বুনো হাতি দেখেনি, বাইসন দেখেনি, পাইথন দেখেনি। বাঘ দেখার তো প্রশ্নই নেই, কারণ, কুসুমপুরের জঙ্গলে বাঘ নেই। তাতে সৌগতর কিচ্ছু আসে যায় না। সে বাঘ দেখবার জন্যে জঙ্গলে আসে না। আসে সুন্দরকে দেখবার জন্যে।

যদি একটা নির্জন পুকুরের বুকে ফুটে থাকে অজস্র শালুক, যদি ভোরের শিউলি গাছের গলায় মাকড়শার জালের নেকলেসে দুলতে থাকে হীরের কুচির মতন হাজারটা শিশিরের ফোঁটা, তাহলেই সৌগত খুশি। আজ সকালেই সে যখন ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে চায়ের সঙ্গে টোস্ট খাচ্ছিল, তখন দুটো বুলবুলি আর একটা শালিখ পাঁউরুটির টুকরোর লোভে একদম তার হাতের

নাগালে এসে বসেছিল। সৌগতর কুসুমপুরে আসা তাতেই সার্থক হয়ে গেছে।

কুসুমপুর এত সুন্দর বলেই সৌগতর মনে হচ্ছিল, চারটে দিনের ছুটি যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল। আজ রোববার। এক ভাড়াগাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, সে তাকে সন্ধেবেলায় খড়্গপুর স্টেশন থেকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন ধরিয়ে দেবে। তাহলে কাল সোমবার সে অফিস করতে পারবে।

মনখারাপ লাগে। প্রত্যেকবারই এই চলে যাওয়ার দিনটায় ভীষণ মনখারাপ লাগে সৌগতর। তার মনে হয়, শেষ দিনটায় যতক্ষণ পারি বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। যতটা পারি পাখি, প্রজাপতি আর গাছের ছবি চোখে ভরে নিয়ে যাই। নদীর বুক থেকে কুড়িয়ে নিই কয়েকটা আঁকিবুঁকি কাটা নুড়িপাথর কিংবা বনের পথ থেকে একটা কুসুমগাছের টুকটুকে লাল পাতা।

খাওয়া—দাওয়ার পর তাই বাংলোর কেয়ারটেকারকে ডেকে সৌগত বলল, একটু ঘুরে আসছি সনাতনদা। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।

বাংলোর বাগান থেকে একটা উটকো ছাগলকে তাড়াতে তাড়াতে কেয়ারটেকার সনাতন মুর্মু বললেন, ঠিক আছে স্যার। ঘুরে আসুন। কোনো অসুবিধে নেই।

বনে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সৌগতর একটা অভ্যেস হয়ে গেছে— অচেনা কোনো পাখি, প্রজাপতি, কোনো বুনো ফুল কিংবা গাছের নাম—টা যতক্ষণ অবধি সে না জানতে পারছে, ততক্ষণ অবধি তার স্বস্তি হয় না।

এমনিতে তার ব্যাকপ্যাকে সবসময়েই অজয় হোমের পাখির বই, নওয়াজেশ আহমদের বাংলার বনফুল, কিংবা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর গাছের হ্যান্ডবুক মজুত থাকে। তাতেও না কুলোলে সে লোকাল লোকজনকে জিগ্যেস করে জেনে নেয় ওদের নাম। তারপর একটা ডায়েরিতে লিখে রাখে।

নদী কিংবা পাহাড়ের নাম জানার জন্যে অবশ্য পুরোপুরি স্থানীয় লোকজন—ই ভরসা। তবে না জেনে ছাড়ে না সৌগত।

আজ অবশ্য সেরকম অচেনা কিছু চোখে পড়ল না। কুসুমপুরের জঙ্গলে গাছ বা পাখির ভ্যারাইটি খুব বেশি নেই। যা কিছু চোখে পড়ল, সবই সৌগতর আগে থাকতেই চেনা।

ঘুরতে ঘুরতে কোনদিকে যে চলে এসেছিল ঠিক বুঝতে পারছিল না সৌগত। শালবনের ভেতর দিয়ে অজস্র শুঁড়িপথ এ ওকে কাটাকুটি করতে—করতে, এদিকে ওদিকে চলে গেছে। আশেপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দারা শুকনো ডালপালা কিংবা শালপাতা কুড়োবার জন্যে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে। এসব তাদেরই পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা পথ। তারই একটা ধরে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সৌগত হঠাৎই দেখল সে বনের বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

দুই

গত তিনদিনের মধ্যে সে এদিকটায় কখনও আসেনি। এখানে তার সামনে কোনো গ্রাম নেই, ফসলের খেত

নেই। তার বদলে রয়েছে এক ধু ধু বালির চরা। তার শুরু দেখা যায় না, শেষ দেখা যায় না। অনেক দূরে আবছা একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এই বনের সীমানা থেকে সেই পাহাড় অবধি শুধুই কাশের ঝোপ আর নলখাগড়ার বন। মাঝে মাঝে একটা—দুটো খেজুর আর বাবলাগাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সৌগতর খুব কাছেই ওরকমই একটা বাবলা গাছের ওপর দুটো শকুন এসে বসল।

সৌগত হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। মাত্র আড়াইটে বাজে। এখনই বাংলোয় ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তাই সে ঠিক করল, ওই চরাটার বুক ধরেই একটু হেঁটে আসবে। ওখানে শুকনো শরঘাসের ঝোপের মধ্যে কয়েকটা পাখি ওড়াউড়ি করছে। কাছে গিয়ে দেখতে হবে ওগুলো কী পাখি। তাছাড়া আরও একটু দূরে একটা ময়ূর আর কয়েকটা ময়ূরী বালির ওপরে পায়চারি করছিল। ওদেরও আরেকটু কাছ থেকে দেখবার লোভ সামলাতে পারল না সৌগত। সে ঢালু পাড় বেয়ে চরার বুকে নেমে পড়ল।

সৌগত ভাবতে পারেনি ওখানে একটা নদী থাকবে, অথচ ছিল। ওপর থেকে দেখতে পায়নি, কিন্তু চরায় নামতেই সৌগত নদীটাকে দেখতে পেল।

নদীটা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু অদ্ভুত তার জলের রং। সাধারণত এরকম পাথুরে জায়গায় নদীর জল হয় কাচের মতন স্বচ্ছ। কিন্তু এই নদীটার জল একদম কুচকুচে কালো। সৌগত ভাবল, নদীটা কি কোনো পাথুরে কয়লার

বেডের ওপর দিয়ে বয়ে এসেছে। সেইজন্যেই কি এরকম কয়লা—গোলা জলের রং?

সৌগত জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জল নয়, যেন গলানো পিচের মতন ভারী কোনো জিনিস এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল সৌগত। এইসব বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলা নদীর জলের মধ্যে কত ভাঙা গাছের গুঁড়ি, কাঠকুটো এইসব পড়ে থাকে। কিন্তু এই নদীটার বুকে একটা শুকনো পাতা অবধি ভাসছে না।

হঠাৎ সৌগতর খেয়াল হল, সে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই কালো জলের নদীটা তাকে যেন এক সম্মোহনে বেঁধে ফেলেছে। মাথাটা একবার জোরে ঝাঁকিয়ে সৌগত নদীর পাড় ধরে আবার হাঁটতে শুরু করল।

তখনই সে ছেলেটাকে দেখতে পেল। এই ফাঁকা জায়গায় হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলেকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে সৌগত বেশ চমকিয়েই গিয়েছিল।

ছেলেটা নদীর ধারে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল। যাকে বলে জড়সড় হয়ে বসে থাকা, একেবারে তাই। কত বয়স হবে ছেলেটার? বড়জোড় দশ কি এগারো। পরনে একটা খাঁকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। গেঞ্জিটার অন্তত চার জায়গায় বড় বড় ছ্যাঁদা। বাঁ হাতের ওপরের দিকে কালো কারে বাঁধা একটা মাদুলি। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এদিকেরই কোনো গ্রামের ছেলে।

ছেলেটার গা থেকে একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। খুব চেনা কোনো সেন্টের গন্ধ, কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না সৌগত। কান্তা? নাকি জেসমিন? ব্যাটা ছেঁড়া গেঞ্জির ওপরে সেন্ট মেখেছে! গাঁইয়াদের কারবার—ই আলাদা।

ও কি নদীর চরায় ছাগল চরাতে এসেছে? কিন্তু তাহলে ছাগলগুলো গেল কোথায়? আর ও ওরকম জবুথবু হয়ে, দু হাতের মধ্যে হাঁটুদুটো জড়িয়ে বসেই বা আছে কেন?

যাই হোক, ওর কাছেই এই নদীর নামটা জেনে নেওয়া যেতে পারে। এই কুসুমপুরে জীবনে আর কখনও আসা হবে কিনা ঠিক নেই। নদীটার নাম না জেনে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না সৌগতর।

ছেলেটার পেছনে দাঁড়িয়ে সৌগত জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, এই নদীটার নাম কী?

ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সৌগত দেখল ওর বড় বড় দুটো চোখে রাজ্যের ভয়। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলল, জানি না।

জানিস না! তুই এখানে থাকিস না?

থাকি তো। এইটুকু বলেই ছেলেটা আবার নদীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। একটু আগে সৌগত যেমন জলের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না, ওর অবস্থাও যেন ঠিক সেইরকম।

সৌগত একটু চুপ করে থেকে বলল, তাহলে নদীটার নাম জানিস না কেন? তোদের দেশের নদী তো।

এই নদীটা আগে কখনও দেখিনি।

সৌগত ভাবল, তা হতে পারে। ছেলেটা বড্ড ছোট। হয়তো এতদূরে আগে কখনও আসেনি। ওর বাবা মা কি সঙ্গে রয়েছে? কোথায় তারা?

সৌগত জিগ্যেস করল, কার সঙ্গে এসেছিস? তোর বাবা মা কোথায়?

ছেলেটা আবার নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সৌগতর দিকে তাকাল। সৌগত দেখল, ভয় নয়, এবার ওর চোখে স্পষ্ট অভিমান। দুদিকে ঘাড় নেড়ে ছেলেটা বলল, মাইয়া, বাপু, কেউ আসেনি। কেউ না। আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছে।

সৌগতর এবার একটা অন্যরকম সন্দেহ হল। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেনি তো বাচ্চাটা? হয়তো বাবা—মার ওপর রাগ করে ঝোঁকের মাথায় একা একা এতদূর চলে এসেছে। তারপর প্রাণে ভয় ঢুকেছে। এখন না পারছে এগোতে, না পারছে পেছোতে। সৌগতর নিজেরই একবার এরকম হয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে বসেছিল, যদি কেউ আদর করে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এসেওছিলেন— বাবা। পুরনো কথা ভেবে সৌগত নিজের মনেই হাসল। তারপর সে নরম গলায় ছেলেটাকে ডাকল, বাড়ি যাবি? চল, আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

উঁহু। ছেলেটা নদীর দিকে তাকিয়েই জবাব দিল। আমাকে ওই নদীটা পেরোতে হবে। কিন্তু আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে।

ছেলেটার বাড়ি কি নদীর ওপারে? নিশ্চয়ই তাই।

সৌগত ওকে সাহস দিয়ে বলল, ভয় কীসের? এইটুকু একটা নদী। তুই তো হেঁটেই পেরিয়ে যেতে পারবি। আসবার সময়েও তো হেঁটেই এসেছিলিস, না কি? যা, ফিরে যা। আর দেরি করিস না। এই বলে সৌগত আবার পা চালাল। একটু দূরে নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকে ওদিক থেকেই যেন মানুষের গলা পেল সে। ওদের কাছেই জেনে নেওয়া যাবে নদীটার নাম।

তিন

সৌগত আর সময় নষ্ট না করে জোরে পা চালিয়ে নদীর বাঁকটার কাছে পৌঁছিয়ে গেল। সেখান থেকেই একবার পিছনদিকে তাকিয়ে দেখল— বাচ্চাটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণে নিশ্চয় ও নদী পেরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। যাকগে। ওকে নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু নেই।

বাঁক ঘুরতেই সৌগতর চোখে পড়ল সামনে একটা চালাঘর। বালির মধ্যে চারটে বাঁশ পুঁতে চারদিক খোলা চালাঘরটা তৈরি করা হয়েছে। মাথার ওপর খেজুর পাতার ছাউনি। ছাউনির নিচে একজন বুড়ো লোক একটা বাঁশের বেঞ্চির ওপরে বসে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছিল। সৌগত এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে একটু হাঁফিয়ে গিয়েছিল। সে গিয়ে সেই লোকটার পাশেই বসল। তারপর জিগ্যেস করল, এই নদীটার নাম কী?

কোথায় নদী? বুড়ো অবাক গলায় সৌগতকে পাল্টা প্রশ্ন করল।

সৌগত সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে গিয়েছিল, ওই যে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। কারণ, সত্যিই সে সামনে তাকিয়ে কোনো নদী দেখতে পেল না। বালির চর, এখন শুধুই বালির চর। সেই কালো নদীটা আর নেই।

বুড়ো তার আঙুলে ধরে রাখা বিড়িটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, অনেককাল আগে এখানে একটা নদী ছিল বলে শুনেছি। তবে আমি কেন, আমার বাপ ঠাকুর্দাও সে নদী চোখে দ্যাখেনি। এখন চরের মধ্যে একটা মজা পুকুর রয়ে গেছে। হয়তো সেই নদীটারই ফেলে যাওয়া জল। ওখানেই আমরা পাঁচ গ্রামের লোকেরা দাহ—টাহ করি।

দাহ!

হ্যাঁ, মড়া পোড়াই। এটা শ্মশান। এই আজ যেমন আমরা শিরালি গ্রাম থেকে এসেছি। ভোরবেলা অজয় মণ্ডলের ছোট ছেলেটা মারা গেল। মাত্র তিনদিনের জ্বর...কী বলব বলুন? ওই দেখুন না, সৎকারের জোগাড়যন্তর চলছে।

বুড়ো থুতনি তুলে যেদিকটা দেখাল, সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সৌগত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ওখান থেকেই সে একটা কিছু দেখেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে তাই ভূতে পাওয়া মানুষের মতন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওইদিকে, যেদিকে অজয় মণ্ডলের ছেলের দাহকার্যের প্রস্তুতি চলছিল।

কয়েকজন লোক মিলে একটা চিতা সাজাচ্ছিল। তারা সৌগতকে দেখেও দেখল না। আর একজন লোক একটু দূরে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তার টকটকে লাল দুটো চোখে শূন্য দৃষ্টি। হয়তো সে—ই অজয় মণ্ডল, যার ছেলে মারা গেছে। তবে ওসব কিছুই আর সৌগতর চোখে পড়ছিল না। সে শুধু তাকিয়ে ছিল চিতার পাশেই বাঁশের চালির ওপর শুইয়ে রাখা মৃতদেহটার দিকে।

বড় বড় চোখদুটো এখন তুলসীপাতা দিয়ে ঢাকা। কিন্তু তবু ওই মুখ ভুল হবার নয়। ওর গা থেকে সেই নাক জ্বালানো মিষ্টি গন্ধটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের স্মৃতির কি অদ্ভুত মতিগতি! তখন মনে পড়েনি, এখন কিন্তু সৌগতর চট করে মনে পড়ে গেল সুগন্ধীটার নাম। অগুরু— মৃতদেহের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে যে লিকুইডটা ছিটোনো হয়। ছেলেটা যখন একটু আগে নদীর ধারে জড়সড় হয়ে বসেছিল, তখনও ওর গা থেকে অগুরুর গন্ধই ছাড়ছিল।

ছেলেটাকে চালির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। এখনও তার পরনে সেই খাঁকি হাফপ্যান্ট আর চার জায়গায় ফেঁসে যাওয়া গেঞ্জি। এমনকী বাঁ হাতের ওপরের দিকে বাঁধা সেই মাদুলিটা অবধি খোলা হয়নি। চিতায় তোলার আগে ওরা সবকিছুই খুলে নেবে নিশ্চয়। সেইরকমই নিয়ম।

বড়জোড় দশ—মিনিট আগে এই ছেলেটাকেই নদীর ধারে বসে থাকতে দেখেছে সৌগত। নদীটা এখন আর নেই, কিন্তু একটু আগেই ছিল। এই বাচ্চাটা তখন

বলেছিল, আমাকে ওই নদীটা পেরোতে হবে। কিন্তু আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে।

সৌগত আস্তে আস্তে পিছন ফিরল। আজ কিছুক্ষণ বাদে সে কুসুমপুর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে নদীর নামটা জানা বড় দরকার...বড় দরকার।

মাতালের মতন টলতে টলতে সে আবার সেই বুড়োর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, বলতে পারেন, সেই যে নদীটা এককালে এখান দিয়ে বইত, তার নাম কী ছিল?

বুড়ো বলল, কেন পারব না? বাপ—ঠাকুর্দার কাছেই শুনেছি, নামটি ছিল বড় বাহারের। একেবারে ইহলোক আর পরলোকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নামে তার নাম। আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন সে নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

কী, বুঝলেন না?

সৌগতকে চুপ করে থাকতে দেখে খিকখিক করে হেসে বুড়ো নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিল—

বৈতরণি।

বোষ্টমবুড়ির বাগান



সত্যিই কোনো দরকার নেই। তবু শিল্পপতি শঙ্কর মণ্ডল প্রতিদিন রাত বারোটায় একবার তাঁর নতুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঘুরে যান।

আসলে এই কাজটা তার ভালো লাগে। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি যে বিরাট দোকানটা শয়ে শয়ে নারীপুরুষের গলার আওয়াজে গমগম করে, এই মাঝরাতে সেই পুরো জায়গাটাই কীরকম অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায়।

ঝকঝকে মার্বেলের মেঝে একটু আগেই শেষবারের মতন ধুয়ে মুছে দিয়ে চলে গেছে সুইপার ছেলেরা। সেই মেঝেতে ছায়া ফেলেছে অসংখ্য আলমারি, সেল্ফ আর কাউন্টার। তার মধ্যে কোনোটায় সার সার টিনে ভরা খাবার— কর্ন, মাশরুম, আচার, জ্যাম। কোথাও থরে থরে

কোল্ড—ড্রিঙ্কসের বোতল। একদিকে একটা দেয়াল জুড়ে যদি শিশুদের বার্বি—ডল আর টেডি বেয়ার তো আরেকদিকে মহিলাদের অজস্র দামি দামি পোশাকের স্তূপ। জুতো থেকে টুপি, ন্যাপথালিন থেকে সেফটিপিন সমস্তই পাওয়া যায় শঙ্কর মণ্ডলের এই সাধের ডিপার্টমেন্টাল—স্টোরে, যার নাম তিনি নিজেই পছন্দ করে রেখেছেন—'সম্ভার'।

বহু টাকা খরচা করে, মাত্র চার মাস আগে এই ডিপার্টমেন্টাল—স্টোর—টা চালু করেছেন তিনি। বলতে নেই, মোহনপুরের মানুষজন যেন এমন একটা দোকানের জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করে ছিল। তারা একেবারে পঙ্গপালের মতন ছুটে আসছে 'সম্ভার'—এর সম্মোহনে। কাউন্টারের কর্মচারীরা দিনের শেষে টাকা গুনে শেষ করতে পারে না।

শঙ্কর মণ্ডল বুঝতে পারেন, তার রাইস মিল, তার অয়েল মিল, তার মোহনপুর বর্ধমান রুটে চলাচল করা চারটে বাস, বড় রাস্তার ওপরে দুটো দোকানঘরের ভাড়া, সব মিলিয়ে এতদিন যা উপার্জন করেছেন, তাকে একবছরের মধ্যে ছাপিয়ে যাবে এই ডিপার্টমেন্টাল—স্টোরের রোজগার।

সেইজন্যেই সম্ভারের ওপর তার এত মায়া। সেইজন্যেই প্রতিদিন মাঝরাতে তিনি নিয়ম করে চলে আসেন এখানে। পায়ে হেঁটেই আসেন। কারণ 'সম্ভার'—এর পাশের দোতলা বাড়িটাই তার রেসিডেন্স।

তিনি আসেন। এসে দশহাজার স্কোয়ার ফিটের বিরাট ঘরটার চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। দেখেন সমস্ত জিনিস আগামীকালের জন্যে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা আছে কি না। দেখেন ঘরের সাজসজ্জা কোথাও নষ্ট হয়েছে কি না, কোথাও সারাইয়ের দরকার আছে কি না। যদিও সব কিছু দেখার জন্যেই শঙ্কর মণ্ডলের মাইনে করা সুপারভাইজার রয়েছে, কিন্তু কে না জানে, মাইনে করা লোকের দেখা আর মালিকের নিজের দেখার মধ্যে অনেক তফাত থাকে।

আরও একটা কথা শঙ্কর মণ্ডল মনে মনে স্বীকার করেন, তা হল, কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তিনি এখানে আসতেন। কারণ এই 'সম্ভার' তার একটা জয়ের চিহ্ন।

সেই জয়কে একা একা, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্যেই তিনি এমন সময়ে আসেন, যখন সেখানে আর কেউ থাকে না।

এখন যেখানে 'সম্ভার', সেখানেই মাত্র একবছর আগে ছিল বোষ্টমবুড়ির বাগান আর কুঁড়েঘর।

বাগান না ঘোড়াড্ডিম। জঙ্গলে ভরা দু বিঘে জমি। আমড়া বাতাবিলেবু পেয়ারার মতন শস্তা আর বুনো গাছে ভর্তি। কুঁড়েঘরটার অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছিল। ছাদের অনেক জায়গাতেই টালি ছিল না। বাগানের কুঁয়োতলায় ইটের ফাটলে ঝোপঝাড় আর পুরু শ্যাওলা। নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই জংলাজমির

দিকে তাকিয়ে শঙ্কর মণ্ডল ভাবতেন, কোনদিন বুড়িটা সাপের কামড়েই মরবে।

তাও বুড়ির এমন অদ্ভুত গোঁ ছিল— কিছুতেই সেই জমি শঙ্কর মণ্ডলের কাছে বেচবে না। বুড়ির ছেলে, সে ব্যাটাও সমান হাঘরে। দুর্গাপুর না কোথায় যেন থাকে। শঙ্কর মণ্ডল তাকেও হাত করেছিলেন, মা কে বুঝিয়ে—বাঝিয়ে রাজি করানোর জন্যে। টাকার লোভে ছেলেটা মাকে দারুণ চাপাচাপি করেছে। মারধর অবধি করেছিল বুড়িকে, তা শঙ্করের নিজের চোখে দেখা। কোনো ফল হয়নি। বুড়ি খালি বলত, ওর স্বামীর লাগানো সব গাছপালা, প্রাণ থাকতে নষ্ট হতে দেবে না।

তারপর গতবছর বুড়ি মরল।

অপঘাতেই মরল বুড়ি। সাপের কামড়ে নয়। কুয়োতলার শ্যাওলায় পা হড়কে পড়েছিল একেবারে খোলা কুয়োর মধ্যে।

অনেক দেরি করে হলেও বুড়ির সঙ্গে লড়াইয়ে শঙ্কর মণ্ডলেরই জয় হল। বুড়ির ছেলেকে ডেকে এনে, তার হাতে টাকাপয়সা দিয়ে জমিটা তিনি নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন। তারপর সেই বাগান আর কুঁড়েঘরকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েই গড়ে তুললেন এই মোহনপুরের গর্ব, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, 'সম্ভার'।

মেন গেটটা সিকিউরিটের ছেলেরা রাত নটাতেই বন্ধ করে দেয়। পাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে প্রতিদিনের মতন দোকানে ঢুকতে ঢুকতে শঙ্করের চোখে পড়ল ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডটা। সেখানে সময়ের সঙ্গে আজকের

তারিখটাও আলোর অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। বারোই জানুয়ারি। ঠিক একবছর আগে এই দিনেই বুড়ি কুয়োয় পড়ে মরেছিল।

হ্যাঁ, গতবছর বারোই জানুয়ারি এইসময়েই পাড়ায় ছেলেরা বোষ্টমবুড়ির মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে রওনা হয়েছিল। খরচাপাতি প্রতিবেশী হিসেবে তিনিই সব দিয়েছিলেন। এমনকি পুলিশে বডি নিয়ে গিয়ে যাতে পোস্টমর্টেমের নামে অনর্থক কাটাছেঁড়া না করে সে ব্যবস্থাও পয়সা দিয়ে তিনিই করিয়েছিলেন। পাড়া পড়শিরা বলেছিল, শঙ্কর মণ্ডলের দিল আছে।

পুরনো কথা জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে শঙ্কর মণ্ডল সম্ভারের ভেতরে পা দিলেন।

এ কী! এত জল এল কোথা থেকে! অবাক হয়ে পায়ের দিকে তাকালেন শঙ্কর মণ্ডল।

সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের ওপরে আবছায়া অন্ধকারে চট করে জলের রেখাটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু শঙ্কর মণ্ডলের পায়ের চটিতে ছিটকে লেগেছে জল। কোনো ভুল নেই তাতে। শঙ্কর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলেন মেঝেটা।

হ্যাঁ, বেশ মোটা একটা জলের ধারা ঠিক তার পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শঙ্কর মণ্ডল। ওঃ! এই সুপারভাইজারগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। নিশ্চয় কোথাও জলের পাইপে বেশ বড়সড় একটা ছ্যাঁদা হয়েছে। কিন্তু বাবুদের সেদিকে মন দেওয়ার সময় নেই। তিনি

মোবাইলের স্ক্রিনের আলোটা সামনে ধরে মাথা নিচু করে জলের রেখাটাকে অনুসরণ করে চললেন। পাইপের ফাটলটা এক্ষুণি বার করতে না পারলে কাল সকালে দোকান খোলার আগে সারানো যাবে না।

পাইপের ফাটল খুঁজে পেলেন না শঙ্কর, তবে তার বদলে দেখতে পেলেন কর্মচারীদের অপদার্থতার আর এক চিহ্ন। যেদিকে পুরুষদের পোশাকের বিভাগ সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই তার চোখে পড়ল একটা 'ম্যানিকুইন'— মানে ওই মানুষপ্রমাণ নকল পুতুল। দোকানের এক কোনায় দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, সেটার গায়ে একটা কর্ডুরয়ের জ্যাকেট। অত দামি পোশাক 'ম্যানিকুইনের' গায়ে চাপিয়ে রাখার ব্যাপারে কড়া নিষেধ আছে তার। একশোজন খরিদ্দার একবার করেও ওই জ্যাকেটটায় হাত বোলালে ওর সমস্ত জেল্লা নষ্ট হয়ে যাবে। দেখাই যাচ্ছে, তার কর্মচারীদের মধ্যে কোনো একজন তার বারণ শুনবার প্রয়োজন বোধ করছে না। ঠিক আছে, কাল সকালে তার ব্যবস্থা হবে। আপাতত তিনি নিজেই জ্যাকেটটা খুলে তুলে রাখবেন। এই ভেবে আবছায়া কোণটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে ছুঁলেন জ্যাকেটটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই কারেন্ট খাওয়ার ভঙ্গিতে হাতটা সরিয়ে নিলেন তিনি।

জ্যাকেটটা ভিজে থসথস করছে।

ওই জ্যাকেটটা থেকে জল ঝরে ঝরেই যে মেঝের ওপরে ছোট নদীটার জন্ম হয়েছে সেটা বুঝতেও কোনো অসুবিধে হচ্ছে না শঙ্কর মণ্ডলের।

কিন্তু তার থেকেও যেটা অবাক কাণ্ড, তা হল, দুমড়ে পড়ে থাকা ম্যানিকুইনটা আস্তে আস্তে উঠে বসছে। সে এবার ঘুরে তাকাল শঙ্করের দিকে।

না, ম্যানিকুইন না। বুড়ি। বোষ্টমবুড়ি।

'বড় শীত করছিল বাবা। এই শীতের রাতে অতক্ষণ কুয়োর মধ্যে পড়ে থেকে হাড় অবধি কাঁপুনি ধরে গেছে। তাই এইটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম।'

বোষ্টমবুড়ি একটা লোহার তাকের ওপর হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল। ছোট্টখাট্টো শালিখপাখির মতন শরীরে ঢোলা আলখাল্লার মতন জ্যাকেটটায় তাকে ঠিক একটা কাকতাড়ুয়ার মতন দেখতে লাগছিল। বুড়ি এবার শঙ্কর মণ্ডলের মুখের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। শঙ্কর পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, সে নিশ্বাস এই পৃথিবীর নয়। প্রবল ঠান্ডায় ঠকঠক করে কেঁপে উঠলেন তিনি। একই সঙ্গে সিকিউরিটিকে হাঁক পাড়তে গিয়ে বুঝতে পারলেন, তার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না।

'তাছাড়া তুমি যে কুয়োয় ফেলার আগে আমার ঘাড়টা ভেঙে দিয়েছিলে, সেই থেকে ঘাড়টাও বেশিক্ষণ সোজা রাখতে পারি না।'

শঙ্কর মণ্ডল দেখলেন, সত্যিই বুড়ির ঘাড়টা মাঝেমাঝেই ন্যাকড়ার পুতুলের মতন বুকের ওপর লটকে পড়ছে।

'কিন্তু আমার কুঁয়োতলায় এসব কি ছাইপাঁশ বানিয়ে তুলেছ বলো তো। উঠে এসে দেখছি আর কিছুই চিনতে পারছি না। আমর ঘরটা কোনখানে রইল একটু দেখিয়ে

দেবে চলো দেখি।' বুড়ি দু পা এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে। শঙ্কর মণ্ডল দু পা পিছিয়ে গেলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল, ঘুরে দৌড় মারেন। এক দৌড়ে বেরিয়ে যান এই দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে। কিন্তু একই সঙ্গে এও বুঝতে পারছিলেন যে, বোষ্টমবুড়ির ওই কালো আগুনের মতন চোখের মণি দুটোর থেকে চোখ সরানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

'ওইখানে আমার করমচা গাছের ঝোপটা ছিল, ওই যেখানে ঝকমকে ইস্টিলের ডেরামের মধ্যে চালডাল জড়ো করে রেখেছ। আর ওই পেলাস্টিকের বালতির পাহাড়টার নিচেই বোধহয় আমার সজনে ফুলের গাছ।'— বুড়ির গলাটা কেমন যেন করুণ শোনাল।

বুড়ির চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে জল আর শৈত্য ছড়িয়ে পড়ছিল। পেছোতে গিয়ে শঙ্কর একবার সেই জল থইথই মেঝের ওপর দড়াম করে আছাড় খেলেন। তিনি পরিষ্কার নিজের কাঁধের হাড় ভেঙে যাওয়ার শব্দ পেলেন। ভয়ে আর যন্ত্রণায় ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছিল তাঁর শরীর। কিন্তু কিছুতেই বোষ্টমবুড়ির প্রেতদৃষ্টির বাঁধন কেটে বেরোতে পারছিলেন না। গড়াতে গড়াতেই শঙ্কর মণ্ডল সরে গেলেন বুড়ির এগিয়ে আসার পথ থেকে। কিন্তু তাঁর চোখ তখনও অনুসরণ করে যাচ্ছিল বুড়ির কার্যকলাপ।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কোনায় কোনায়, দেয়ালে দেয়ালে, মেঝেতে, ছাতে, সর্বত্র একটা বাদুড়ের ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোষ্টমবুড়ির প্রেত। সেই প্রেতের হাহাকারে মাঝেমাঝেই কেঁপে উঠছিল 'সম্ভার'—এর

অভিজাত অন্দরমহল। সেই প্রেত খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার হারিয়ে যাওয়া বাগান আর ঘর, আর খুঁজে না পেয়ে নিজের অজান্তেই ডুকরে কেঁদে উঠছিল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেল, খেয়াল নেই শঙ্কর মণ্ডলের। একবার শুধু সে অবাক হয়ে ভেবেছিল সিকিউরিটির ছেলেটা তার দেরি দেখেও খোঁজ নিতে আসছে না কেন! তার পরেই তার কানে এসেছিল বাইরে থেকে প্রবল বৃষ্টি আর বজ্রপাতের আওয়াজ। অসময়ের বৃষ্টি আর জাঁকিয়ে নামা ঠান্ডায় পুরো মোহনপুর শহরটাই যেন একটা কম্বলের নিচে ঢুকে পড়েছে। নিশ্চয় ছেলেটা ভাবছে, বাবু বৃষ্টি না থামা অবধি ভেতরেই অপেক্ষা করবে। সেরকমটা ভাবাই তো স্বাভাবিক।

চারিদিকে নজর চালিয়ে সেই প্রেতছায়া আবার এসে দাঁড়াল শঙ্কর মণ্ডলের সামনে। বাইরে খুব জোরে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। তার আলোয় শঙ্কর স্পষ্ট দেখল বুড়ির শরীর থেকে কখন যেন খসে পড়ে গেছে সেই ঢোলা জ্যাকেটটা। সত্যি বলতে কি মাংস চামড়া সবই যেন খসে পড়েছে তার গা থেকে। হাড়সার একখানা হাত বাড়িয়ে বুড়ি এক হ্যাঁচকা টানে মাটিতে পড়ে থাকা শঙ্কর মণ্ডলকে দু পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। ভাঙা হাতের প্রবল যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন শঙ্কর।

'চলো, খুঁজে দাও আমার ঘরখানা। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? ওই দিকেই তো ছিল। চলো চলো!' বুড়ি হিড়হিড় করে শঙ্কর মণ্ডলকে ধরে টেনে নিয়ে চলল যেদিকে বাচ্চাদের খেলাধুলোর সরঞ্জাম আর তুলোর

পুতুলের বিরাট সংগ্রহ দেওয়াল জুড়ে সাজিয়ে রাখা ছিল। বুড়ির গা থেকে জলের ধারা ঝরছে তো ঝরছেই। তার মধ্যে দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বোষ্টমবুড়ি শঙ্কর মণ্ডলকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলল সেই ছাদ অবধি উঁচু করে সাজানো পুতুলের তাকের নিচে। এত কষ্টের মধ্যেও শঙ্করের মনে পড়ল, আজ যদি তিনি এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা বানিয়ে না তুলতেন, তাহলে ঠিক এইখানটাতেই থাকত বুড়ির ভাঙা টালি ছাওয়া ঘর। ঘরের জায়গাটা চিনে নিতে কোনো ভুল হয়নি একবছর বাদে ফিরে আসা ঘরের মালিকের।

'খুঁজে দাও, খুঁজে দাও, খুঁজে দা আ আ আ ও! — তীব্র চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল শঙ্করের। একটা পা দিয়ে তাকে মেঝেতে চেপে রেখে বুড়ি এবার হাত দিয়ে টেনে আছড়ে ফেলতে শুরু করেছে তাকের পুতুলগুলো। বিরাট বিরাট টেডি—বেয়ার, গালফোলা খরগোশ, ল্যাজতোলা কাঠবেড়ালি, জোকার আর বেবি পুতুল খসে পড়তে লাগল শঙ্করের মুখের ওপর।

নিচের তাকগুলো খালি করে বুড়ি এবার হাত বাড়িয়েছে ওপরের তাকে...আরও ওপরে...আরও ওপরে। ক্রমশই লম্বা হয়ে যাচ্ছে তার হাত, আর পুতুলের পর পুতুল ঝরে পড়ছে শঙ্করের মুখের ওপর। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন সেই তুলোর মতন নরম সব পুতুলের দমবন্ধ করা কবর থেকে নিজেকে মুক্ত করার। কিন্তু কোনো লাভ হল না। বুড়ির কঙ্কালসার পা তাঁকে পেরেকের মতন গেঁথে রেখে দিয়েছে তারই স্বপ্নের

সম্ভারের মেঝেতে। আস্তে আস্তে শঙ্কর মণ্ডলের শরীরটা পাহাড়প্রমাণ পুতুলের স্তুপের নিচে হারিয়ে গেল।

পরদিন সকালে মোহনপুর থানার ও.সি. সব দেখে শুনে স্বীকার করলেন যে, এমন অদ্ভুত অ্যাকসিডেন্ট তিনি তাঁর চাকরি জীবনে কমই দেখেছেন। পুতুলের তাক ভেঙে পড়ে পুতুল চাপা পড়ে মৃত্যু... নাঃ, সত্যিই ভাবা যায় না।

শুধু একটা ব্যাপারই তিনি বুঝতে পারছিলেন না—সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এত বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকল কোথা দিয়ে।

নরকের চলচ্চিত্র



রাজশেখর সেন একবার টেবিলের ওপরে রাখা ডিজিটাল ক্লকটার দিকে তাকালেন। বারোটা বাজতে এখনও দশ মিনিট বাকি রয়েছে, তবু এখনই পাড়াটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

বাঁশদ্রোণির ভেতরের দিকটায় এখনও একটু মফসসলের ছাপ আছে। এখানে ছোট ছোট একতলা দোতলা বাড়ি আছে, রাস্তার ধারে কয়েকটা পুকুর আছে, কলাগাছের ঝাড় আছে। এমনকী মেন রোড থেকে একটু দূরে হেঁটে গেলে এক—দুটো বাঁশবন অবধি দেখা যায়।

কয়েক বছর আগে অবধি এমন নির্জন রাত্তিরে হঠাৎ হঠাৎ শেয়ালের ডাক শোনা যেত। আজকাল আর শোনা

যায় না। শহর এগিয়ে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে পুকুর, বাঁশবন, কলাগাছ আর শেয়ালেরা।

তবু অন্তত রাতের দিকে এই পাড়াটায় এখনও নির্জনতা পাওয়া যায়। আর সেইজন্যেই বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও রাজশেখর সেন বাঁশদ্রোণি ছেড়ে কোনো দামি জায়গায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাননি। নিস্তব্ধতা না থাকলে মাথায় নতুন চিন্তা আসে না। সমস্তদিন শু্যটিং—ফ্লোরে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে তিনি সেই নৈঃশব্দ্য খুঁজে পান।

বাগানের দিকে যে জানলাটা, তার সামনেই তার লেখার টেবিল। ওই টেবিলের সামনে পেতে রাখা চেয়ারটায় বসে তিনি জানলার মধ্যে দিয়ে অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেখেন হাস্নুহানা গাছে জোনাকির আলো দপদপ করছে। বাতাসের সঙ্গে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টটার টিমটিমে বাল্ব থেকে একটু আলো এসে পড়ে গুলঞ্চ গাছের ডালে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, অন্ধকার জলের ওপরে অনেকগুলো ডুবন্ত মানুষের হাত যেন বাঁচার আশায় ছটফট করছে।

আস্তে আস্তে রাজশেখরের চোখের সামনে থেকে তার চেনা বাগানের দৃশ্য মুছে গিয়ে অন্য কোনো ছবি ভেসে ওঠে। কোনো ভয়ের দৃশ্য। তিনি স্ক্রিপ্ট লেখার খাতার ওপরে ঝুঁকে পড়েন। দ্রুত চলতে থাকে তার হাতের কলম। সৃষ্টি হয় আরও একটা হইচই ফেলে দেওয়া হরর—ফিল্মের গল্প আর চিত্রনাট্য।

হ্যাঁ, পরপর কয়েকটা গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ের সিনেমা তৈরি করার পরে রাজশেখর সেনের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও তার পরিচালিত ভয়ের ছবি প্রশংসিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে যে ছবিটা তিনি বানাচ্ছেন, তার ইনডোর আর আউটডোর শ্যুটিং কমপ্লিট। তবু সিনেমাটা তিনি রিলিজ করতে পারছেন না। তার কারণ, সিনেমাটার কয়েকটা জায়গায় কম্পিউটার—গ্রাফিক্স আর অ্যানিমেশনের দরকার ছিল আর সেই কাজটা রাজশেখর সেন যাদের দিয়েছিলেন সেই "অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরস" কাজটা শেষ করতে অনেক সময় নিয়ে নিল।

এর মধ্যে ফোনে, ই—মেলে, চিঠিতে রাজশেখর সেন অনেকবার তাদের তাগাদা দিয়েছেন, রাগারাগি করেছেন। ওদের দিক থেকে শুধু সংক্ষিপ্ত উত্তর এসেছে— আরেকটু সময় দিন, আরেকটু। তবে শেষ অবধি ওরা কাজটা কমপ্লিট করতে পেরেছে। আজকেই স্টুডিওয় স্পেশাল মেসেঞ্জারের হাত দিয়ে পৌঁছে গেছে সিডি—র প্যাকেট।

শুযটিং—এর ব্যস্ততার মধ্যে সেই প্যাকেট খুলে দেখবার সময় পাননি রাজশেখর সেন। এবারে কম্পিউটারটা অন করে প্যাকেটটা খুললেন। সিডি—টা চালিয়ে দেখতে হবে কাজটা ওরা কেমন করল।

প্যাকেটটা খুলে রাজশেখর সেন একটু অবাক হলেন। শুধু সিডি—ই নেই, সঙ্গে রয়েছে অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরসের ডিরেক্টর সুধাময় প্রধানের লেখা একটা চিঠি। চিঠিটা বেশ লম্বা।

এত সব কী লিখেছেন মিস্টার প্রধান? কৌতূহল নিয়ে রাজশেখর সেন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

ডিয়ার মিস্টার সেন,

অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরসের ডিরেক্টর হিসেবে আপনার সমস্ত অভিযোগ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। সত্যিই আপনার কাজ শেষ করতে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেল। তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

হয়তো এইটুকু লিখেই এই চিঠি শেষ করে দেওয়া যেত। তাতে ব্যবসায়িক সৌজন্যও রক্ষা হত। কিন্তু আমার বিবেক বলছে আর কয়েকটা ঘটনা আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত। হয়তো আপনি আমাকে পাগল ভাববেন, তবুও।

আপনি যে কাজটা আমাদের দিয়েছিলেন সেটা ছিল চ্যালেঞ্জিং, ভীষণই চ্যালেঞ্জিং। আপনি আমাদের বানিয়ে দিতে বলেছিলেন নরকের চলচ্চিত্র। স্টুডিয়োয় নয়, কম্পিউটারের স্ক্রিনে। আপনি চেয়েছিলেন লেলিহান আগুন। সেই আগুনের রং যেন পৃথিবীর কোনো আগুনের মতন না হয়। আপনি চেয়েছিলেন সেই আগুনের মধ্যে সারি সারি ছায়ামূর্তি। তাদের মুখে যেন লেগে থাকে যন্ত্রণার ছাপ। তবে সব শেষে আপনি পুরো ব্যাপারটাই আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু বলেছিলেন যাই বানাই না কেন, তার মধ্যে যেন নরকের একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে ওঠে।

আমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিলাম অনির্বাণকে। অনির্বাণ মজুমদার। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র কিন্তু সবথেকে প্রতিভাবান। দু'বছর আগে সিলিকন ভ্যালির একটা কলেজ থেকে অ্যানিমেশনে ডিগ্রি নিয়ে এসে আমাদের সংস্থায় ও যোগ দিয়েছিল।

আমাদের এই অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরসে এমন অনেক কর্মী আছেন যাঁদের এক্সপেরিয়েন্স কিংবা টেকনিকাল নলেজ অনির্বাণের চেয়ে বেশি। কিন্তু গত দু'বছরে অনির্বাণ তাঁদের ওপরে টেক্কা দিয়েছে একটাই কারণে— ওর মতন কল্পনাশক্তি আর কারুর মধ্যে ছিল না।

কোনোকিছু নিখুঁতভাবে কপি করতে বললে অনির্বাণ পারত না, রেগে যেত। কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে বললে ওর ফুর্তি দেখে কে? তখন ও জান লড়িয়ে দিত সেই কাজটার পেছনে। আর এরকম এক—একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হওয়ার পরে আমরা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হতাম, এমন অরিজিনাল কাজ আগে এদেশে দেখিনি। ওর কাজের দৌলতে অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরসকে আই—টি সেক্টরের রথী—মহারথীরাও সম্মান করতে শুরু করেছিল।

তাই অনির্বাণ মজুমদারকেই আমি নরকের চলচ্চিত্র বানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কারণ, নরক সম্বন্ধে তো আর কারুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই। ওখানে ওর কল্পনাশক্তিই কাজে লাগত।

অনির্বাণ কিন্তু তা বিশ্বাস করত না। সেটা যখন বুঝতে পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি শুধু দেখেছিলাম, কাজটা হাতে পাওয়ার পরেই অনির্বাণ বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। নানা রকমের বই। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা চামড়ায় বাঁধানো অ্যান্টিক বই, কলেজস্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনে আনা বৃষ্টির ছিটে লাগা বাদামি পাতার বই, নানান ইউনিভার্সিটির জার্নালস, পিরিয়ডিক্যালস, রিসার্চ পেপার। আর সবার ওপরে ই—বুক তো ছিলই। অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও বহুক্ষণ ও নিজের কিউবিকলে ঘাড় গুঁজে বই পড়ত। তখন শুনশান অফিসে থাকতাম কেবল আমরা দুজন— আমি আর অনির্বাণ।

অ্যাসাইনমেন্টটা ওকে দেওয়ার মাস—দুয়েক পরে, অমনই এক জনহীন সন্ধ্যাবেলায়, অনির্বাণ হঠাৎ স্যুইং—ডোর ঠেলে আবার চেম্বারে ঢুকল। ওকে দেখে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল। চোখদুটো কেমন যেন ঘোরলাগা।

আমি বললাম, বসো অনির্বাণ। কিছু বলবে?

অনির্বাণ বলল, হ্যাঁ, একটাই কথা বলব বলে এলাম। আমার বিশ্বাস নরক ব্যাপারটা কাল্পনিক নয়। রূপক তো নয়ই। সত্যিকারেই নরক রয়েছে, যেমন রয়েছে এই কলকাতা শহর।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি বেশি পড়াশোনা করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ঘোর সন্দেহ হল, অনির্বাণের হয়তো তাই হয়েছে। তবু বহু বছর ধরে অফিস চালাচ্ছি

তো। মনের কথা বেমালুম মনে চেপে রেখে বললাম, কেমন করে বুঝলে?

অনির্বাণ উত্তর দিল, সে তো এককথায় আপনাকে বোঝাতে পারব না। তবে পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্য, লোককথা, উপকথায় নরকের যে বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে অদ্ভুত মিল। এটা কখন সম্ভব বলুন তো?

তুমিই বলো।

যখন জিনিসটা বাস্তবে থাকে। কল্পনায় কল্পনায় তফাত থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে কোনো তফাত থাকে না। আকাশকে সব দেশের লোকই নীল রং দিয়ে আঁকবে। ঘাসকে সব দেশের লোকই সবুজ বলবে। সেইরকমই নরকের ছবিও সব দেশে এক, কারণ মৃত্যুর পরের এক জগৎ সত্যিই রয়েছে।

ওর সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম। বলতে পারতাম, পৃথিবীর সব মানুষের মনেই মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে একটা ভয় থাকে। সেই ভয়টাই গানে, গল্পে কিংবা লেখায় ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। বলতে পারতাম, ভয়টা যেহেতু এক, তাই ছবিগুলোও এক। কিন্তু আমি সেসব না বলে বললাম, বাঃ। তাহলে তো তোমার কাজ সহজ হয়ে গেল। ওইসব গল্পে যা—যা পাচ্ছ, তার ওপরে বেস করে মিস্টার সেনের অ্যানিমেশনের কাজ—টা নামিয়ে দাও না। এতবড় একজন পরিচালকের প্রোজেক্ট আমাদের জন্যে পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা তো ভালো কথা নয়।

উঁহু! বেশ জোরেই ঘাড় নাড়ল অনির্বাণ। বলল, ওসব গল্পে বছরের পর বছর এত রং চড়েছে যে, এখন আর

আসল ছবিটাকে খুঁজেই পাবেন না। ওইসব লোককথা উপকথাকে মডেল ধরে অ্যানিমেশন বানালে আপনি ভয় পাবেন না। হেসে ফেলবেন।

অনির্বাণের কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমাদের তো ভয়ের ছবি—ই দরকার। তাই ওকেই আবার জিগ্যেস করলাম, তাহলে কী করবে ভাবছ?

অনির্বাণ প্রায় স্বগতোক্তির মতন করে বলল, একবার যদি মৃত্যুর পরের জগৎটা নিজের চোখে দেখে আসতে পারতাম!

ওর পাগলের মতন কথা শুনে এইবার আমি মেজাজ হারালাম। কড়া গলায় বললাম, শোনো অনির্বান। যাই করো আর তাই করো, মিস্টার সেনের কাজটা কিন্তু আর একমাসের মধ্যে শেষ করে দিতে হবে। তার বেশি সময় দিতে পারব না।

মাত্র একমাস! ওর গলায় হতাশা স্পষ্ট।

আমি বললাম, হ্যাঁ, একমাস। তিরিশ—দিন। তার মধ্যেই তুমি আমাকে তোমার কাজ হ্যান্ড—ওভার করবে।

তার ঠিক দুদিন বাদেই অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনির্বাণের গাড়িটা এক্সপ্রেসওয়ের একটা উঁচু ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেল। ও একাই ছিল গাড়িতে। মারা গিয়েছিল অনির্বাণ।

ওর গাড়িটা কোনো অ্যাকসিডেন্টের ফলে ব্রিজ থেকে পড়ে গিয়েছিল? নাকি ও নিজেই নিজেকে ছুড়ে দিয়েছিল শূন্যের বুকে?

আজ আমার সন্দেহ হয় দ্বিতীয়টাই ঠিক। অনির্বাণ নিজের চোখে নরক দেখতে গিয়েছিল।

মিস্টার সেন, বুঝতে পারছি আপনার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। তবে আমার কাহিনিও শেষ হয়ে এসেছে।

অনির্বাণের মৃত্যুর দু'দিন পরের ঘটনা। মানে আজ থেকে ঠিক পনেরোদিন আগে। তারিখটা ছিল আঠেরো জানুয়ারি। সেই রাতে যেমন শীত পড়েছিল তেমন শীত কলকাতায় অন্তত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পুরো শহরটাই যেন একটা মর্গের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেই রাতেই, রাত বারোটার সময় আমার সেল—ফোনটা বেজে উঠল। ঘুমজড়ানো চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকালাম। দেখলাম ফোন করেছেন মিস্টার আহুজা। নিউ আলিপুরে রাস্তার যেদিকে আমাদের অ্যাডভান্সড অনিমেটরসের অফিস, তার ঠিক উলটোদিকেই মিস্টার আহুজার বাড়ি। কিন্তু এত রাতে ওঁর ফোন কেন!

মোবাইলটা কানে লাগিয়ে বললাম, হ্যালো মিস্টার আহুজা।

ওদিক থেকে জবাব ভেসে এল—মিস্টার প্রধান, শান্তভাবে শুনুন। ডোন্ট গেট প্যানিকড। আপনার অফিসে আগুন লেগেছে। আমি প্রথমেই ফায়ার—ব্রিগেডে ফোন করেছিলাম। ইন ফ্যাক্ট ওরা পৌঁছেও গেছে। বাট ইউ শুড কাম ইমিডিয়েটলি।

মিস্টার আহুজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি নিয়ে দৌড়লাম অফিসের দিকে। যখন অফিসে পৌঁছলাম ততক্ষণে আগুন

নিভে গেছে। চারিদিক জলে থইথই করছে, কিন্তু আর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফায়ার—ব্রিগেডের লোকজন যতক্ষণে বিদায় নিল, ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে গেছে। ক্লান্ত শরীরে মিস্টার আহুজার ড্রইং—রুমে গিয়েই বসলাম। ওঁর কাজের লোক আমাদের সামনে দু—কাপ গরম কফি রেখে গেল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মিস্টার আহুজা প্রশ্ন করলেন, আপনার অফিসে কি রাতে কেউ থেকে গিয়েছিল মিস্টার প্রধান? আপনার কোনো এমপ্লয়ি?

চমকে উঠলাম। বললাম, না তো। একথা কেন জিগ্যেস করছেন?

না... মানে আমি তো অনিদ্রারোগী। রোজকার মতন জানলার ধারে বসে বই পড়ছিলাম। তার মধ্যেই একবার চোখ তুলে দেখলাম আপনার অফিসের ভেতর একটা ছায়া চলাফেরা করছে। একটামাত্র কিউবিকলেই আলো জ্বলছিল। লোকটা সেই কিউবিকলে কম্পিউটারের সামনে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, আবার মাঝেমাঝে উঠে এসে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে যেন কিছু একটা নেমে আসবে।

আমি ভেবেছিলাম, আপনার—ই কোনো স্টাফ ওভারটাইম করছে। একটু পরেই হঠাৎ কিউবিকলের আলোটা নিভে গেল আর তারপরেই আগুনের প্রথম হলকাটা দেখতে পেলাম।

শুকনো গলায় বললাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিস্টার আহউজা। তবে আমার কোনো স্টাফ যে কাল রাতে অফিসে ছিল না এ ব্যাপারে আমি সিওর।

কিন্তু ধরুন, অফিস ছুটির পরে কেউ যদি লুকিয়ে বসে থাকে।

অসম্ভব! আমি নিজে অফিসের প্রত্যেকটা কর্নার চেক করে নিজের হাতে তালা দিয়ে বেরোই। তাছাড়া কে আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করবে?

তবে কি আমিই ভুল দেখলাম? হতে পারে। বয়স হচ্ছে। বিমর্ষ গলায় বললেন মিস্টার আহুজা।

না, মিস্টার আহুজা ভুল দেখেননি। পরের দিন অফিস পরিষ্কার করে নতুনভাবে কাজ শুরু করলাম। আমার নিজস্ব কম্পিউটারটা আমার নিজস্ব পাস—ওয়ার্ড দিয়ে খুললাম এবং খুলেই দেখলাম ডেস্কটপে একটা নতুন আইকন জ্বলজ্বল করছে। তার নাম "নরকের চলচ্চিত্র"।

হ্যাঁ, মিস্টার সেন। ওই নামে একটা আধঘণ্টার ভিডিও —ক্লিপিং কেউ আমার কম্পিউটারে আপলোড করে দিয়েছিল।

না, এমন অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন নেই। স্পষ্ট করেই বলি। তাতে যদি আপনি আমাকে উন্মাদ ভাবেন তো ভাবুন। মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে এসে অনির্বাণ ওই ছবি আমার কম্পিউটারে আপলোড করে দিয়েছিল। এইভাবেই ও কমপ্লিট করে গিয়েছিল ওর অ্যাসাইনমেন্ট।

আমি, কেবল আমিই আমার কম্পিউটারে দেখেছি সেই ভিডিও। ঠিকই বলছি, অ্যানিমেশন নয়। ভিডিও ফোটোগ্রাফি। যা ঘটছে, ক্যামেরা দিয়ে তারই রেকর্ডিং। বানানো কিছু নয়। কিন্তু সেই চলচ্চিত্র এই জগতের নয়। আগুনের অমন বিভৎস রং আমরা পৃথিবী মানুষেরা কোনোদিন দেখিনি। সেই আগুনের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে যে জীবগুলো, তারাও এই জগতের কেউ নয়। কোনো মানুষের শরীর ওইভাবে যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে পারে না। অত যন্ত্রণায় কোনো মানুষ বেঁচে থাকতেও পারে না। ওরা প্রেত।

এই চিঠির সঙ্গেই ওই ভিডিও ফুটেজের সিডি পাঠিয়ে দিলাম। আমার কাছে কোনো কপি রাখলাম না। কারণটা বুঝতে পারছেন কি? আমি ভয় পেয়েছি।

আপনি ভিডিওটা নিজে দেখুন। তারপর স্থির করুন আপনার সিনেমায় ওটা ব্যবহার করবেন কি না। যদি আমার পরামর্শ শোনেন তাহলে বলব ওটা ব্যবহার করবেন না। ফেলে দিন। নষ্ট করে ফেলুন। মৃত্যুর পরের জগতে উঁকি মারার অধিকার বোধহয় আমাদের, মানে জীবিত মানুষদের নেই।

'বোধহয়' বলছি কেন? নিশ্চয়ই নেই। তার প্রমাণ কী জানেন? আমার অফিসের ওই আগুন।

পরলোক থেকে তার কাজ শেষ করে যাওয়ার জন্যে ফিরে এসেছিল অনির্বাণ। জানি না মৃত্যুর পরে কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল সে, কিন্তু সেরকম কোনো ক্ষমতার জোরেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল

নরকের ছবি। রেখে গিয়েছিল আমার কম্পিউটারে। কিন্তু নরকের প্রহরীরা ছাড়বে কেন? তারা ধাওয়া করেছিল অনির্বাণকে। জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল আমার কম্পিউটার সমেত পুরো অফিসটাকেই। পারেনি শুধু মিস্টার আহুজা জেগে ছিলেন বলে।

কিন্তু ওরা কি চেষ্টা ছাড়বে? মনে হয় না। সেইজন্যেই আবার বলছি, নষ্ট করে ফেলুন সিডিগুলো। নরকের জীবদের ঘাঁটাবেন না।

ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন। ইতি— সুধাময় প্রধান।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ওটাকে মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেললেন রাজশেখর সেন। রাগে তার মুখ থমথম করছে। দাঁতে দাঁত শিপে বললেন, ওল্ড শিট। নিজের অপদার্থতা ঢাকবার জন্যে ভূতের গল্প বানাচ্ছে। কাজটাকে জগাখিচুড়ি করে ছেড়েছে নিশ্চয়ই। একবার চালিয়ে দেখে নিই, তারপর প্রধানের মজা দেখাচ্ছি।

সিডির স্লটে সিডিটা ঢুকিয়ে ফাইল ওপন করলেন রাজশেখর সেন। ঠিক তখনই ফুলের গন্ধকে সরিয়ে একটা পচা গন্ধ ঢুকে পড়ল তার জানলা দিয়ে। জোনাকিগুলো ভীষণ ভয়ে হাস্নুহানার ঝোপ ছেড়ে ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

পরেরদিন শহরের সবকটা বড় কাগজে মোটামুটি এই ভাষায় একটা খবর বেরোল—

"গতকাল রাত বারোটা নাগাদ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় বাংলা ছবির পরিচালক রাজশেখর সেন। পুলিশ এবং ফরেনসিক—বিশেষজ্ঞদের কথায় জানা যাচ্ছে, তিনি তাঁর বাঁশদ্রোনির বাড়ির একতলার ঘরে বসে কম্পিউটারে কিছু কাজ করছিলেন। এই সময় সম্ভবত শর্ট—সার্কিট থেকে তাঁর কম্পিউটারে আগুন লেগে যায়। সাধারণত এমন আগুনের শিখা বেশিদূর ছড়ায় না। কিন্তু কালকের ঘটনায় আগুনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, রাজকুমারবাবু তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠবারই সময় পাননি। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর শরীর। আগুন যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল তেমনই হঠাৎই নিভে যায় বলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ,কম্পিউটারটি ছাড়া ঘরের আর কোনো জিনিসের ক্ষতি হয়নি। রাজকুমারবাবুর মৃত্যুতে অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর আগামী ছবি, যেটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাঁর সহকারী।

উইলিয়াম ব্রিজের প্রহরীরা



উনিশশো তিরানব্বইয়ের বর্ষায় উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় যে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল তার

কথা আজও অনেকের মনে থাকতে পারে। সেবার ডুয়ার্সের পূর্বদিকে ভুটানের সঙ্গে লাগোয়া অঞ্চলটাকে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিল পাহাড় থেকে হঠাৎ নেমে আসা একটা হড়পা বান বা ফ্ল্যাশ—ফ্লাড।

ডিমা, নিমাতি, ডায়না, কালজানির মতন ছোট ছোট নদী, যে সব নদীতে সারাবছর পায়ের পাতা ভেজানোর মতন জলও থাকে না, সেগুলোই হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল। জল থাকে না বলেই ওইসব নদীর চরে গরিব মানুষরা ঘর বাঁধে, কলার বাগান কিংবা তরমুজের খেতি করে, গরু বাছুর চড়ায়। কিন্তু উনিশশো তিরানব্বইয়ের পঁচিশে জুলাই রাতে— রাগী বাচ্চা যেভাবে হাতের এক ঝটকায় লুডোর বোর্ড থেকে যাবতীয় সাজানো ঘুঁটি ফেলে

দেয়— ঠিক সেইভাবে ওইসব নদীর ফুঁসে ওঠা গেরুয়া জল সমস্ত বাগান, ফসল, ঝুপড়ি, গরু বাছুর ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। মানুষও মারা গিয়েছিল অনেক।

শুধু যে নরমসরম গ্রামগুলোর ওপরেই আঘাত এসেছিল তাই নয়, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অনেক কঠিন জিনিস। হ্যাঁ, আমি ব্রিজগুলোর কথাই বলছি। অজস্র ইস্পাতের ব্রিজকে উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই বন্যা; কিংবা ভেঙেচুরে পিণ্ড পাকিয়ে দিয়েছিল। এখনও ওই অঞ্চলের নতুন করে গড়ে তোলা সেতুগুলোর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় ডাইনে বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়ে সেইসব পুরোনো ব্রিজের ভাঙা থামগুলো সার বেঁধে রিভার—বেডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, ওদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো যে ব্রিজটা, যেটার বয়েস তখনই ছিল প্রায় একশো ছুঁইছুঁই, সেই জুনালি নদীর ওপর উইলিয়াম ব্রিজ যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। আমাদের মধুঝোরা চা বাগানের একদম গায়েই ওই জুনালি নদী আর উইলিয়াম ব্রিজ। বন্যার পরে বাগানের সকলেই ধন্য ধন্য করল ব্রিটিশ স্থপতি আর্চার উইলিয়ামের নামে। সকলেই বলল, এমনই মালমশলা আর ডিজাইন ব্যবহার করেছিলেন উইলিয়াম সাহেব, যে অমন ক্ষ্যাপা হাতির মতন হড়পা বানও একটা বল্টু অবধি খসাতে পারেনি ওই ব্রিজের গা থেকে।

শুধু আমাদের বৃদ্ধ নাইটগার্ড রঘুদা, রঘুনাথ ওরাওঁ, ব্রিজ ভেঙে না পড়ার কৃতিত্বটা দিলেন অলৌকিক এক

শক্তিকে।

আমি রঘুদার সঙ্গে একমত হলাম। না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ উনিশশো তিরানব্বইয়ের পঁচিশে জুলাই গভীর রাতে আমি উইলিয়াম ব্রিজ পেরিয়েছিলাম। আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম সেই অলৌকিককে।

তখন আমি মধুঝোরা টি—এস্টেটের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সবে বছর তিনেক হল চাকরিতে ঢুকেছি। যেহেতু 'জুনিয়র', তাই ঝক্কিঝামেলার কাজ থাকলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পীযূষ সেন সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন। সেদিনও তাই হল। শনিবার বিকেলের দিকে, চায়ের পাতাগুলোকে প্যাকেজিং—প্ল্যান্টের দিকে নিয়ে যায় যে কনভেয়র বেল্টটা, সেটার একটা গিয়ার—হুইল ভেঙে গেল। আমাদের প্ল্যান্টটার বয়েস প্রায় সত্তর বছর। অত পুরোনো মেশিনপত্রের পার্টস এখন আর কিনতে পাওয়া যায় না, তাই ভেঙে যাওয়া জিনিস সারিয়ে নিয়ে কাজ চালাতে হয়। গিয়ার—হুইলটা ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়েই পীযূষদা বললেন, রুদ্র, তোমাকে তো তাহলে কাল একটু শিলিগুড়ি যেতে হচ্ছে। বুঝলাম, শিলিগুড়ি মানে পালবাবুর ওয়ার্কশপে। উনিই আমাদের মেরামতির কাজগুলো করেন। খুব অভিজ্ঞ কারিগর। পীযূষদাকে বললাম, ঠিক আছে যাব।

পরদিন রবিবার, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ভাঙা গিয়ার—হুইলটাকে একটা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে

অফিসের জোঙ্গা জিপটায় উঠে শিলিগুড়ির দিকে রওনা দিলাম। গাড়ি বেরোনোর জন্যে কারখানার লোহার গেটটা খুলে দিতে এসেছিলেন রঘুদা। আমাকে একা ড্রাইভ করতে দেখে বললেন, আরেকজন কাউকে সঙ্গে নিলে ভাল হত না সাহেব?

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, যেরকম গুমোট হয়েছে, মনে হচ্ছে বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টি হবে।

ঝড়বৃষ্টি আর এই ডুয়ার্সে নতুন কী? আমি উত্তর দিলাম। তাছাড়া আজ রবিবার। ছুটির দিনটা বরবাদ করে কে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে বলো তো? এই বলে, রঘুদার সাবধানবাণী উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়লাম।

শিলিগুড়ি নির্বিঘ্নেই পৌঁছলাম, কিন্তু তারপর গিয়ারটা সারাতে পালবাবুর অসম্ভব বেশি সময় লেগে গেল। কাজ শেষ হতে হতে বেজে গেল সন্ধে সাতটা। মনে একটু আশঙ্কা নিয়েই রাস্তায় নামলাম, কারণ সন্ধের পর জঙ্গলের রাস্তায় ডাকাতির ভয় খুব। তখনও অন্য কোনোরকম ভয়ের কথা আমার স্বপ্নেও মনে আসেনি।

দুপুরের সেই গুমোটটা ততক্ষণে আরও বেড়ে গিয়েছিল। গাড়ির জানলার কাচ পুরোপুরি নামিয়ে দিয়েছিলাম, তবু যেন একটুও হাওয়া ঢুকছিল না। দরদর করে ঘামছিলাম। তিস্তার ওপর জুবিলি ব্রিজ পেরোনোর সময় সামনে তাকিয়ে দেখলাম পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়ার মতন মেঘ জমে রয়েছে। তার মানে ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে খুব। একটু বাদে সেই বৃষ্টি সমতলে নেমে এল। প্রথম

ফোঁটাটা যখন আমার উইন্ডস্ক্রিনের কাচে আছড়ে পড়ল, তখন ঘড়িতে বাজে ঠিক আটটা, আর আমি পেরিয়ে গেছি তিনভাগের একভাগ পথ।

এরপরেই যেটা শুরু হল সেটাকে এক কথায় 'প্রলয়' বলা চলে। আমার চোখের সামনেই রাস্তার দুপাশের অনেকগুলো বড় বড় গাছ ঝড়ের দাপটে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। বাজ পড়ছিল মুহুর্মুহু। তার সঙ্গে বৃষ্টি। সেরকম বৃষ্টি আমি তার আগে বা পরে আর কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন একটা জলপ্রপাত ভেদ করে চলেছি। একহাত দূরের রাস্তাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে আনতে বাধ্য হলাম। ভাগ্য ভালো, রাস্তায় আর কোনো গাড়ি ছিল না। থাকলে মুখোমুখি ধাক্কা লাগতেই পারত।

যে সময়ে আমার মধুঝোরা পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল, সেই সময়ে আমি পৌঁছলাম কালচিনি। মানে পুরো পথের মাত্র অর্ধেকটা। বাঁ দিকে বাঁক নিলাম। এরপর মধুঝোরা পর্যন্ত পুরো রাস্তাটায় আর কোনো লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে চা বাগান, মাঝে মাঝে অরণ্য। আর প্রতি এক কিলোমিটার অন্তর একটা করে পাহাড়ি ঝোরা। চিরকাল সেই সব ঝোরার সামান্য জলের বুক চিরে অনায়াসে জিপ চালিয়ে পারাপার করেছি। কিন্তু আজ এ কী চেহারা হয়েছে সেই ছোট ছোট ঝোরাগুলোর! এইটুকু সময়ের মধ্যে এত জল কোথা থেকে এল ওদের বুকে! আমার জিপের চাকার প্রায় অর্ধেকটা ডুবে যাচ্ছিল সেই ঘোলা জলে। শেষ ঝোরাটা পার হওয়ার সময় হঠাৎই টের

পেলাম আমার বাহন মাটির ওপর থেকে কামড় ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে নিয়ে জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আমার জিপ। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। এই কি তবে শেষ? এইভাবেই কি মৃত্যু হবে আমার? না। একটু বাদেই নদীর তলায় ছড়ানো পাথরে আবার চাকা আটকালো। টপ গিয়ার দিয়ে প্রাণপণে গাড়িটাকে তুলে নিলাম সেই ঝোরার ঢালু পাড়ের ওপর।

হয়তো তখনই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ার কথা ছিল, কারণ সামনে অল্প পথ বাকি। সেই পথে আর কোনো সেতুবিহীন ঝোরা নেই। রয়েছে একটা মরা নদী। জুনালি। এবং সেই নদীর ওপরে রয়েছে একটা ব্রিজ। একশো বছরের পুরোনো হলেও রীতিমতন ইট আর ইস্পাতে বানানো একটা বিরাট ব্রিজ। উইলিয়াম ব্রিজ। তবু কি জানি কেন ব্যাখ্যাহীন এক আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছিল। মনের ভেতর থেকে কে যেন বারবার বলছিল, রুদ্রদেব, বিপদ। ভীষণ বিপদ অপেক্ষা করে আছে তোমার সামনে।

অথচ সেই সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ও তো নেই। কারণ ইতিমধ্যে রাস্তাটাও হয়ে গেছে খরস্রোতা এক নদী। জিপের চাকার তলায় পরিষ্কার টের পাচ্ছি সেই নদীর প্রবল চোরাটান। আজ রাতে আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলে ওই বন্যার টান আমাকে আমার গাড়িশুদ্ধ টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে অসংখ্য পাহাড়ি নদীর কোনো একটার গর্ভে। তাই থামলে চলবে না।

নির্জন নিষ্ঠুর পথ ধরে আমি অন্ধের মতন এগিয়ে চললাম।

বৃষ্টি একইভাবে হয়ে চলেছিল, কমবার কোনো লক্ষণই দেখছিলাম না। কতক্ষণ চলেছিলাম জানি না। হঠাৎ একসময়ে চোখে পড়ল নিকষ অন্ধকারের মধ্যে অনেকদূরে চিকমিক করছে মধুঝোরা টি গার্ডেনের আলো। আমার বুকের মধ্যে চেপে বসা তীব্র আতঙ্ক সেই আলোর ছোঁয়ায় একটু হালকা হয়েছিল, কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যাতে সেই মৃত্যুভয় দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। আমি বুঝতে পারলাম আজ রাতে আমার পক্ষে বেঁচে ফেরা খুব কঠিন।

জিপের হেডলাইটের আলোয় আমি দেখতে পেলাম জুনালি নদীর ভয়াল রূপ।

এই জুনালিকে আমি চিনি না। এই জুনালি আমাদের টি—এস্টেটের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সেই ছোট্ট ঝোরাটা নয়, যার জলে সারাদিন আমাদের কুলিব্যারাকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঝাপাই জোড়ে, মেয়েরা কাপড় কাচে, এমনকী ছোট্ট ছাগলছানাটাও যে নদীর সামান্য জল নির্ভয়ে পার হয়ে যায়। এ এক অন্য জুনালি; এর শরীরে নিশ্চয় কোনো অশুভ আত্মা ভর করেছে। না হলে কেমন করে এর জল গভীর খাতকে ছাপিয়ে উঠে আসে রাস্তার পাশে? তীব্র স্রোতের আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দেয়? একেকবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর সেই আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— শিলিগুড়ি যাবার পথে যে শান্ত জুনালিকে আমি দেখে গিয়েছিলাম, কয়েকঘণ্টার মধ্যে সে এক মৃত্যুনদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার জলে ভেসে

যাচ্ছে গবাদি পশুর মৃতদেহ, বড় বড় গাছের উপড়ে আনা শরীর, এমনকী মানুষের শব অবধি।

আর উইলিয়াম ব্রিজ? আমি তীরে দাঁড়িয়েই পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই পুরোনো জরাজীর্ণ ব্রিজটা দুলছে। নদীর বুকে যে তিনটে পুরোনো আমলের ইটের স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিজের লোহার শরীরটা, সেই স্তম্ভগুলোর গায়ে জলের ধাক্কা লেগে পাক খেয়ে উঠছে অজস্র ঘূর্ণি। সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে। ওই জলের আঘাত সহ্য করে আর কতক্ষণ ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ওই থামগুলো?

তবু আমাকে উঠতেই হবে ওই ব্রিজে। যে ভাবে হোক পেরিয়ে যেতে হবে এই নদীকে। কারণ হেড লাইটের ছড়িয়ে পড়া আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছি জুনালির খরস্রোত হিংস্র পশুর মতন পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে এইদিকে। নদী এগিয়ে আসছে আমাকে গিলে খেতে। ভয়ে আমার স্টিয়ারিং—এর ওপর রাখা হাতদুটো থরথর করে কাঁপছিল। তবু অ্যাপ্রোচ রোডের বাঁকটা ঘুরে জিপটাকে তুলে দিলাম ব্রিজের রাস্তায়। আর তারপরেই প্রাণপণে ব্রেক চিপে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বলা যায় বাধ্যই হলাম ব্রেক চিপতে, কারণ তিনটি শিশু দাঁড়িয়েছিল উইলিয়াম ব্রিজের মাঝখানে; রেলিং ধরে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল পায়ের সামান্য নীচ দিয়ে বয়ে চলা জলস্রোতের দিকে।

তিনটি শিশুই প্রায় উলঙ্গ। কোমরে একটা করে ন্যাকড়া জড়ানো। গায়ের রং কুচকুচে কালো। বুঝতে বাকি রইল না—আমাদের মধুঝোরা টি—এস্টেটের কুলি ব্যারাক থেকেই পালিয়ে এসেছে বাচ্চাগুলো। পালিয়ে এসেছে বন্যা দেখতে। জানে না মৃত্যুর কত কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। আসলে ছেলেগুলো ভীষণই ছোট, বিপদের বোধই ওদের তৈরি হয়নি এখনও।

এইইই! আমি জিপের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের ডাকলাম। কী করছিস ওখানে?

ছেলে তিনটে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো।

তেমন কোনো কারণ ছিল না, তবু আমি একটু কেঁপে উঠলাম। কী বিষণ্ণ ওদের চোখগুলো! সেই চোখে বন্যা দেখার আনন্দ কিংবা উত্তেজনা কিছুই নেই। আমার দিকে একপলক তাকিয়েই ওরা আবার মুখ ফিরিয়ে নিল নদীর দিকে। কী দেখছে ওরা অত মন দিয়ে? ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম নদীর উজানের দিকে, মানে যেদিক দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে জলের ঢল।

কিছুক্ষণ থেকেই গুম গুম করে একটা শব্দ ভেসে আসছিল। এবার দেখতে পেলাম সেই শব্দের উৎসকে। নদীর বুক জুড়ে আড়াআড়ি এগিয়ে আসছে একটা কালো পাঁচিল।

পাঁচিল নয়, আসলে একটা ঢেউ।

সেই দানবিক ঢেউয়ের মুখে ওলটপালট খেতে খেতে এগিয়ে আসছে অসংখ্য উপড়ানো গাছ, ঘরের চাল, আস্ত

একটা বাঁশঝাড় আর কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ।

কেউ বলে দেয়নি, তবু কি ঘটেছে তা বুঝতে আমার এক মুহূর্তও লাগল না। পাহাড়ের ওপরে কোথাও একটা নদীর বাঁধ জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গিয়েছে। বাঁধের বুকে জমে থাকা পুরো জলটাই জুনালির খাত ধরে নেমে আসছে। ওই একটা ঢেউয়ের মধ্যে জমে আছে সেই সম্পূর্ণ বাঁধভাঙা জলের শক্তি।

মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখে হঠাৎই আমার মনটা খুব শান্ত হয়ে গেল। আমি স্থির দৃষ্টিতে সেই ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম— আর কতক্ষণ? আধমিনিট? পনেরো সেকেন্ড? ওইটুকুই আমার আয়ু। সেই সময়টুকু পেরিয়ে গেলেই ওই জলের পাঁচিল এই উইলিয়াম ব্রিজকে, আমাকে আর ওই বাচ্চা তিনটেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

বাচ্চা তিনটের কথা মনে পড়তে আমি সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওরা আর ব্রিজের ওপরে নেই। ওরা নদীর বুকে নেমে গেছে। জুনালির তিনটে থামকে আড়াল করে, দুপাশে দু হাত ছড়িয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জলের ওপর ধোঁয়ার মতন দুলছে ওদের শরীরগুলো। ছোট্ট শরীরগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে...মস্ত বড়। জলের বুকে এক ফোঁটা কালি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেইভাবে হাওয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ছে ওদের শরীর। এখন আর হাত, পা, মাথা আলাদা করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু চোখগুলো— সেই বিষাদ মাখানো তিন জোড়া চোখকে এই অন্ধকারের মধ্যেও কেমন করে জানি না, স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি আমি। দেখতে পাচ্ছি আরও একটা জিনিস। চোখ না সরিয়েই সেই বিরাট ঢেউটাকে দেখতে পাচ্ছি এখন। তার এগিয়ে আসার শব্দ আমার কান ফাটিয়ে দিচ্ছে। এমনকী তার ভিজে ভিজে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধও আমার নাকে ঢুকছিল।

ওই শিশু তিনটের রূপান্তর দেখে, হাতের এত কাছে মৃত্যুকে দেখে আমার হয়তো জ্ঞান হারানো উচিত ছিল। কিন্তু মানবমস্তিষ্কের রহস্য কে বলতে পারে? আমি চেতনা হারালাম না। আমি জিপের সিটে বসে বসেই দেখলাম, সেই করাল ঢেউ ওই তিন শিশুর শরীরে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল— স্তম্ভ তিনটেকে স্পর্শও করতে পারল না। থামের মাঝখানের শূন্য জায়গা দিয়ে তীব্র বেগে চলে গেল জলের রাশি, আর সামান্য একটু ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল উইলিয়াম ব্রিজ। তারপর আবার স্থির হয়ে গেল।

শুনেছি, সেদিন অনেক রাতে, ঝড়বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে প্রচণ্ড এক সংঘাতের শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছিল মধুঝোরার মানুষজন। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল তারা ঘর থেকে। দেখেছিল বাগানের বন্ধ লোহার গেট ভেঙে ঢুকে এসেছে আমার জোঙ্গা জিপ। ড্রাইভারের আসন থেকে আমাকে যখন নামিয়েছিল তখন আমার জ্ঞান ছিল না। আমি জানি তার অনেক আগেই আমি চৈতন্য হারিয়েছিলাম। গাড়ি চালিয়েছিলাম, যেভাবে ঘুমের মধ্যে কোনো কোনো মানুষ হেঁটে যায়, সেইভাবে।

টি—এস্টেটের নিজস্ব হাসপাতালে বিভিন্ন সহকর্মী আমাকে দেখতে আসতেন। আমি বেঁচে ফিরেছি বলে তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন, আর ধন্যবাদ দিতেন আর্চার উইলিয়াম বলে এক সাহেবকে, যিনি না কি একশো বছর আগে অজর অমর করে বানিয়েছিলেন ওই ব্রিজটাকে।

শুধু রঘুদা, মানে রঘুনাথ ওঁরাও আমাকে দেখতে এসে বললেন, ওরা কেউ বিশ্বাস করে না সাহেব, কিন্তু উইলিয়াম ব্রিজ কোনোদিনই ভেঙে পড়বে না। তার কারণ, ওই ব্রিজকে তিন 'নানহা দেও' রক্ষা করছেন।

নানহা দেও! মানে শিশু দেবতা! সে কীরকম? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রঘুদা গলা নমিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, বাবার কাছে শুনেছি, ব্রিজের ভিত তৈরি করার সময় হেড মিস্ত্রি বিহার থেকে তিনটে গরিব বাচ্চাকে কিনে এনেছিল। একশো বছর আগে এসব প্রথা খুব চালু ছিল সাহেব। বাচ্চা তিনটেকে বলি দিয়ে রিভার বেডে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ওদের শরীরের ওপর গেঁথে তোলা হয়েছিল উইলিয়াম ব্রিজ। তখনকার দিনে লোকে বিশ্বাস করত, ওই বাচ্চাদের আত্মা ব্রিজকে বন্যা থেকে, ঝড় থেকে রক্ষা করবে। আমরাও এখনও সে কথাই বিশ্বাস করি সাহেব।

আমার মনে পড়ে গেল সেই তিন জোড়া বিষণ্ণ চোখের কথা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম বৃষ্টি—থামা সকালের আলোয় ভেসে যাচ্ছে শান্ত জুনালি নদী আর অটুট উইলিয়াম ব্রিজ।

সেই দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি কিন্তু তোমার কথাই বিশ্বাস করি রঘুদা।

লাল বল



পল্লব অবাক হয়ে দেখল, কুড়ি বছর বাদে লাল বলটা আবার মণিপুকুরের জলে ভেসে উঠেছে।

মাঝের প্রত্যেকটা বছর পল্লব এইভাবেই দুর্গাপুজোর নবমীর দিনে, মণিপুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বলটাকে কোনোবারেই দেখতে পায়নি। আজ সেই হারিয়ে যাওয়া বল নিজে থেকেই চোখের সামনে বেরিয়ে এসেছে।

বলটাকে দেখে প্রথমেই যে চিন্তাটা পল্লবের মাথায় এল, তা হল, সামান্য একটা রবারের বল কি এতদিন আস্ত থাকে। নষ্ট হয়ে যায় না? না কি বলটা প্রাণপণ চেষ্টায় আজকের দিনটার জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পল্লব অবাক হয়ে ভাবল যে, মধ্যের কুড়ি বছরে সে নিজে দশ থেকে পৌঁছে গেল তিরিশে, তার অনেকগুলো চুলে রুপোলি রং লাগল, তার চোখে চশমা উঠল, সে

দৌড়োতে ভুলে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য দ্যাখো— বলটার একটুও বয়েস বাড়েনি!

বহুক্ষণ ধরে দুটো আওয়াজ বাতাসে গড়াগড়ি খাচ্ছিল — হালদারবাড়ির দুর্গাদালান থেকে ভেসে আসা ঢাকের গুমগুমানি আর অর্জুন গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে থাকা একটা ঘুঘু পাখির নরম স্বরের কূজন। যে মুহূর্তে পল্লবের চোখ লাল বলটার ওপর পড়ল, সেই মুহূর্তেই দুটো আওয়াজই একসঙ্গে থেমে গেল। থেমে গেল বলেই পল্লব বুঝতে পারল আওয়াজ দুটো ছিল; বুঝতে পারল এবার কী ভীষণ নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে উঠেছে তার চারদিকে।

আর ওই একই সময়ে একটা জাহাজের মতন বড় মেঘ এসে পল্লবের মাথার ওপরের আকাশটাকে ঢেকে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মণিপুকুরের জলের রংটাও নীল থেকে বদলে হয়ে গেল তিমি মাছের মতন পেছল কালো। সেই কালো জলের মধ্যে আগের থেকেও আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল লাল টুকটুকে ক্রিকেট বলটা। যেন ওইখানে তিমিমাছটার পিঠে হারপুন বিঁধেছিল। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

পল্লব আস্তে আস্তে পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। এখন তাড়াহুড়ো করার সময় নয়। ওই বল আজ এমনি এমনি ভেসে আসেনি। কিছু একটা হবে আজ। হবেই। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

পড়ন্ত শরতের দুপুরে মাটি থেকে ভাপ উঠছিল। ভেসে আসছিল ঝোপের মধ্যে ফুটে থাকা ভাট ফুলের গন্ধ। পল্লব মাথা তুলে দেখল, সেই মেঘটা একই জায়গায় স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখল, একটা নীল ফড়িং বারবার ঘাসের ডাঁটির ওপর এসে বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে।

দূরে চোখ মেলে দিয়ে পল্লব দেখল, শহরের শেষপ্রান্তে, তাদের ছোটবেলার মানিকপিরের মাঠে, দুয়েকটা সদ্য তৈরি হওয়া বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে এখনও পাকা রাস্তা তৈরি হয়নি। ইলেকট্রিকের খুঁটিও পোঁতা হয়নি। নেহাত যাদের উপায় নেই, তারাই বোধহয় এই তেপান্তরে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে এসেছে। বাড়িগুলো প্রত্যেকটাই ভীষণ একলা। একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব অনেক। এতদূর থেকেও বাড়িগুলোর মনখারাপ টের পেল পল্লব।

সেটাও ছিল একইরকমই শরতের দুপুর, দুর্গানবমী। নুটু, রানা, বিশু, স্বপন— ওরা সবাই বাঁশের বাখারির উইকেট, প্যাকিং কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি ব্যাট এইসব কাঁধে তুলে নিয়ে হইহই করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। বলল, একটু বাদেই হালদারবাড়ির নবমীর বলি হবে। দেখতে যাবি না?

বিলাস তাই শুনে ওদের পেছনে খোঁড়া পা নিয়ে হাঁটিতে শুরু করেছিল। পল্লবই ওকে পেছুডাক দিয়ে থামাল। এই, তুই কোথায় যাচ্ছিস? তোর তো পাঁঠাবলি দেখলে গা গুলোয়।

বিলাস বলল, না আমি বাড়ি যাব।

এখন বাড়ি গিয়ে কাউকে দেখতে পাবি না কি?

বিলাসের বয়েস তখন নয়। পল্লবের মাসতুতো ভাই, ওর থেকে ঠিক এক বছরের ছোট। পুজোয় পল্লবদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। বিলাসের পোলিও বলে একটা অসুখ হয়েছিল। সেই জন্যে ওর ডান পা—টা ছিনে পড়া, বাঁকা। ওই খারাপ পায়ের ওপর হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে, ভালো পাটা টেনে টেনে বিলাস চলাফেরা করে।

খোঁড়া পায়ের জন্যে বিলাসের কিচ্ছু আটকায় না। ডান হাতটা ডানপায়ের হাঁটুতে রেখে কুঁজো হয়ে দুলে দুলে দারুণ জোরে হাঁটে। হাফপ্যাডেল করে সাইকেল চালায় আরও জোরে। সবচেয়ে বড় কথা বিলাস প্রত্যেকবছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

পল্লবের কথা শুনে বিলাস বলল, কেনরে ছোড়দা? দেখতে পাব না কেন?

মা, বাবা, সেজোমাসি তিনজনে বেলুড়মঠে ঠাকুর দেখতে গেছে। ওদের ফিরতে এখনও অনেক দেরি। আমি জানি। আমিও তো প্রত্যেকবারেই যাই। তোর জন্যেই এবার বাড়িতে রয়ে গেলাম।

বিলাসের মুখটা পল্লবের এই কথায় একটু ম্লান হয়ে গেল। খিদে পেয়েছিল বলেই বাড়ি ফিরতে চাইছিল বোধ হয়। পল্লব ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, চল না, আরেকটু ক্যাচ ক্যাচ খেলি।

কথাটা বিলাসের মনোমতো হল। সে এক গাল হেসে হাফপ্যান্টের পকেট থেকে নতুন ক্যাম্বিস বলটা বার করে হাঁটতে হাঁটতে জমিটার অন্যপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলটা আস্তে করে ছুড়ে দিল পল্লবের দিকে।

হিংসে হয় বিলাসকে দেখলে। বোধহয় ওর একটা পা খোঁড়া বলেই, কিংবা হয়তো ক্লাসে ফার্স্ট হয় বলে ওর বাবা মা ওকে কোনো জিনিসে না করে না। এই পুজোয় পল্লব একটা ক্যাপ ফাটানোর বল্টু পেয়েছে, কিন্তু বিলাস পেয়েছে দারুণ একটা রিভলবার। বল্টুর মধ্যে একটা একটা করে ক্যাপের টিপ ঢুকিয়ে আছাড় মেরে ফাটাতে হয়, আর রিভলবারে ক্যাপের ফিতে ঢুকিয়ে দিলেই হল। পল্লব একটা ক্যাপ ফাটাতে না ফাটাতেই বিলাস একদম মেশিনগানের মতন ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই করে দশটা ফাটিয়ে দিচ্ছে।

পল্লবের হাফপ্যান্ট, কিন্তু বিলাসের বেলবটম।

পল্লবের সবুজ রবারের বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধওয়ালা এক টাকার বল, দুবার ওভার বাউন্ডারি মারলেই পেট ফেটে যায়। কিন্তু বিলাসের...

...বিলাসের ছুড়ে দেওয়া লাল ক্যাম্বিস বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখল পল্লব। যেন বল নয়, একটা ছোট্ট পোষা প্রাণী। তুলোর মতন মিহিন লোমে সারা গা ঢাকা। বলটা হাতের মুঠোয় ধরে নিজের গালে একবার বুলিয়ে নিল পল্লব। আঃ! কী আরাম। কী সুন্দর তাজা ঘাসের মতন গন্ধ বলটার শরীরে। এরকম একটা বলের জন্যে সেও বাবার কাছে পাঁচটা টাকা চেয়েছে অনেকবার। পায়নি।

কী রে ছোড়দা! বলটা খেয়ে ফেলছিস না কি? থ্রো কর।

বিলাসের শরীরের অনেকটা দূর দিয়ে বলটা ছুড়ল পল্লব। বেড়ালকে এগিয়ে আসতে দেখলে বাসা থেকে পড়ে যাওয়া পাখির বাচ্চা যেরকম ডানা ঝাপটে দৌড়োয়, ঠিক সেইভাবে বিলাস হুমড়ি খেয়ে দৌড়ে বলটাকে ধরল। তারপর অভিমান মাখানো গলায় বলল, একটু কাছাকাছি দে ছোড়দা! আমি কি তোদের মতন ব্যালেন্স রাখতে পারি?

পল্লব বলটা হাতে নিয়ে দেখল, মাথার ওপর একটা চিল ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। বিলাসের পেছনে চড়া রোদ্দুরে ঝলমল করছে মণিপুকুরের জল। সে এবারে বলটা ছুড়ল বিলাসের মাথার ওপর দিয়ে।

বিলাস লাফাল। বলটা হাতের নাগালে পেল না। পাওয়ার কথাও ছিল না। মাটিতে নামবার সময় আগে তার অপুষ্ট ডান পা জমি ছুঁল। সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল বিলাস।

কিছুটা দূরে 'টবাং' করে একটা শব্দ হল। মণিপুকুরের জলে গা ভাসিয়েছে লাল বল।

দু—চোখে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ পল্লবের দিকে চেয়ে রইল বিলাস। তারপর দু—হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে সোজা করল। হেঁটে গেল মণিপুকুরের পাড়ে। পেছন পেছন পল্লবও গেল।

মণিপুকুরের জল কেউ ব্যবহার করে না, ব্যবহার করার লোকই তো নেই কাছাকাছি। তাই এই পুকুরটায় বাঁধানো কোনো ঘাটও নেই। নানান জংলা গাছ আর

ঝোপঝাড়ে ভরতি পুরো পাড়টা। সেই খাড়া পাড় নেমে গেছে নাকফুল আর শালুকে ঢাকা জলের দিকে। এক জায়গায় ছোট ছোট সাদা নাকফুলের লতাগুলো একটু সরে গেছে। সেখানেই স্থির হয়ে ভাসছে লাল বলটা। পাড় থেকে খুব একটা দূরে নয়। হাত বাড়ালেই পাওয়া উচিত, না হলে বড়জোর হাঁটুজলে নামতে হবে।

বিলাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পল্লব। বলল, বলটা তুলে আন না ছোড়দা।

পল্লবের মনে পড়ে গেল কাল রাত্তিরে, সবাই শুয়ে পড়ার পর বাবা আক্ষেপ করে মাকে বলছিল— দ্যাখো, বিলাস তো তোমারই বোনের ছেলে। অথচ ওর মাথা কত শার্প। চোখদুটো দেখেছ? যেন হীরের মতন ঝকমক করছে। আমাদের ছেলেটা এত ডাল হল কী করে? একটা অঙ্ক দশবার বুঝিয়েও ঠিক করাতে পারি না?

বর্তমানে ফিরে এল পল্লব। চিৎকার করে বলল, পারব না। আমি কি তোর চাকর না কি? নিজের বল, নিজে কুড়িয়ে আন। ও পরিষ্কার দেখতে পেল, এই কথায় বাবার প্রশংসিত সেই হীরের মতন চোখদুটোর ওপর একটা আবছা জলের পরদা নেমে এল।

পল্লবকে আর কিছু না বলে বিলাস খুব সাবধানে তার ভালো পা—টা এগিয়ে দিল পাড়ের ঢালু জমিতে। তবুও ওর শরীরটা পিছলে গেল, ও হড়কে গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। ছিটকে ওঠা জলে বিলাসের শার্টের পেটের কাছটা অবধি ভিজে গেল। পল্লব দেখল, বিলাসের জলে আছড়ে

পড়ার ধাক্কায় বলটা একটু সরে গেছে, তবুও এখনও ওটা ওর হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে।

পল্লব পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল তুলে নিল।

একটা বেজি পাড়ের আকন্দ ঝোপের মধ্যে গোলাপি নাকটা বার করে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। পল্লবকে ঢিল তুলতে দেখেই সুট করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। পল্লব টিপ করে ঢিলটা ছুড়ল— বেজিটার দিকে নয়, বলটার দিকে।

ঢিলের ঘায়ে বলটা অন্তত ছ'ফুট দূরে ভেসে গেল। বিলাস চিৎকার করে উঠল— ছোড়দা—আ—আ—আ। তার গলায় জেদি রাগ। এবং কিচ্ছু না ভেবে জলের ওপর দু—হাত থাবড়ে বলটার দিকে এগিয়ে গেল বিলাস। কিন্তু জলের মধ্যে নেতিয়ে পড়া ডান পাটায় হাতের ভর দিতে পারল না তাই দু—পা গিয়েই বিলাসের শরীরটা টলটল করে উঠল। তার পরেই পল্লব দেখল, কখনও চিৎ হয়ে, কখনও উপুড় হয়ে বিলাস ভেসে যাচ্ছে মাঝপুকুরের দিকে।

পল্লব দেখল, বিলাসের সামনে সামনে, যেন তাকে পথ দেখিয়েই ভেসে যাচ্ছে লাল বল।

একেকবার বিলাসের মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠছে আর তার ঠোঁটের কাছে উঠে আসছে বড় বড় বাতাসের বুড়বুড়ি। ও কি ছোড়দা, ছোড়দা বলে চিৎকার করছে? না কি, বাঁচাও বাঁচাও বলে? কে জানে।

শেষবারের মতন একটা বড়সড় ঢিল তুলে লাল বলটার দিকে ছুড়ল পল্লব। যথেষ্ট। বিলাসের হাতের নাগালের

অনেক বাইরে চলে গেছে বলটা।

প্যান্টের পেছনে ভিজে হাতটা মুছতে মুছতে পল্লব দেখল, জলের ওপর বিলাসের চুলে ভরা মাথা আর চোখদুটো একবার ভেসে উঠল। সেই চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টি। তার দিকেই তাকিয়ে আছে বিলাস। তার পরেই পুরো মাথাটা ডুবে গেল মণিপুকুরের জলে।

হালদারবাড়ির পুজোমণ্ডপের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করল পল্লব। বলি শুরু হয়ে গেছে। ঢাক বাজছে চড়চড় করে।

কুড়ি বছর আগের সেই দুপুরে পল্লব বুঝতে পারেনি যে, ওই বিস্ফারিত দুটো চোখের দৃষ্টি তাকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াবে। সব সময় নয়...ঠিক যখনই সে কোনো কিছু পেতে যাবে, হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে, তখনই। তখনই একটা ভিজে চুলে ভরা মাথার নীচ থেকে দুটো ভয়ার্ত চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে পল্লব। তার আর কোনো কিছু পাওয়া হবে না। কোনো কাজ শেষ করতে পারবে না সে।

জানা অঙ্কের শেষ ধাপে এসে তার চোখ পড়ে যাবে ওই চোখদুটোর দিকে। তার আর উত্তর মেলানো হবে না। দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ ল্যাপে এসে, ফিতে ছোঁয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে হঠাৎ শুনতে পাবে মণিপুকুরের জলে লাল বল ছিটকে পড়ার 'টবাং' শব্দ। সে সম্মোহিত মানুষের মতন উঠে আসবে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে

থেকে। তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছেও তার কোনো জীবিকা থাকবে না।

তার জন্যে তার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মারা যাবে, তার মায়ের সব চুল অকালে সাদা হয়ে যাবে।

কুড়ি বছর আগের সেই নবমীর দুপুরে পল্লব ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, সে বিলাসকে নয়, তার নিজেরই সমস্ত আনন্দকে খুন করে চলে এসেছে।

প্রতি বছর নবমীর দুপুরে পল্লব সবার চোখ এড়িয়ে মণিপুকুরের তীরে এসে দাঁড়ায়। মনে মনে বলে, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বিলাস। মুক্তি দে আমাকে। আমাকে একটু বাঁচতে দে।

কিন্তু আজ অবধি, কোনো বছরেই মণিপুকুরের জলে কোনো চিহ্ন খুঁজে পায়নি পল্লব— না বিলাসের, না লাল বলের। যেন কোনোদিন কোনো শিশু ডুবে মরেনি ওই জলে, এমনই নিষ্পাপ সেই জলের চেহারা। তাই আজ কুড়ি বছরের ব্যবধানে লাল বলটাকে পুকুরের মাঝখানে ভেসে আসতে দেখে পল্লবের বুকের রক্ত চলকে উঠল। সে ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বসে বসে দেখতে লাগল সামান্য হাওয়ায় মণিপুকুরের জলে কেমন অল্প অল্প ঢেউ উঠছে। সেই ঢেউয়ের দোলায় কেমন দুলছে লাল ক্যাম্বিসের বলটা। দেখতে দেখতে ঘোর লেগে গেল পল্লবের চোখে।

হঠাৎই তার বুকের মধ্যে থেকে কে কেন বলল, এই বলটা আমার খুব প্রিয়। সবে কালকেই ওটা মা আমাকে

কিনে দিয়েছে। ওটা আমি হারিয়ে যেতে দেব না। বলটা আমার চাই।

চমকে উঠে চারপাশে তাকাল পল্লব। কে বলল কথাগুলো?

বলটা আমার চাই—ই—ই— বাইরে নয়, পল্লবের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর হয়ে উঠল এক বালকের চিৎকার।

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। এই আওয়াজ তার নিজের ভেতর থেকেই আসছে। এই আওয়াজ পল্লবের নয়...বলটার জন্যে এই ভয়ঙ্কর আগ্রহও তার নয়। বিলাসের।

পল্লবের শরীরের মধ্যে থেকে বিলাস চিৎকার করছে। বিলাস মাথা কুটছে পল্লবের বুকের মধ্যে। দাও দাও দাও। ফেরত দাও আমার বল। ফেরত দাও, ফেরত দাও।

সেই আর্তনাদ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা তার নেই। পল্লব উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের জন্যে পল্লব বুঝতে পারল সে এক ন'বছরের বালকে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই নির্জন মণিপুকুরের ধারে আজ সে বিলাস হয়ে যাচ্ছে। ওই বলটাকে তার মনে হচ্ছে জীবনসর্বস্ব। ওটা ছাড়া বেঁচে থাকাই মিথ্যে।

এই মনে হওয়াটা তার নয়, বিলাসের। কুড়ি বছর আগে এইরকম মন নিয়েই বিলাস তার বিকলাঙ্গতা ভুলে জলে নেমেছিল।

পল্লব মণিপুকুরের ঢালু পাড়ে পা রাখল।

তার শরীরটা পিছলে গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। তার চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে, কাদার মধ্যে। তবু পল্লব থামল না, কিংবা বলা ভালো থামতে পারল না। তার বুকের ভেতর থেকে দুটো ছোট ছোট হাত তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল জলের দিকে। ঢেউয়ের ধাক্কায় বলটা একটু সরে গিয়েছিল। দু—হাতে পানা সরাতে সরাতে পল্লব গোঁয়াড়ের মতন সেই দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে পল্লব একবার তাকিয়েছিল জলের মধ্যে ডুবে থাকা নিজের পায়ের দিকে। দেখেছিল ডান পা—টা কেমন যেন সরু আর বাঁকা লাগছে। কেন? তা মাথায় ঢুকল না পল্লবের। তখন তার ওসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই ছিল না। বুকের মধ্যে বিলাস ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে—সময় নেই, সময় নেই, দেখছ না বলটা ভাসতে ভাসতে মাঝপুকুরে চলে যাচ্ছে?

আর দু—পা এগোতেই পল্লবের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। তবুও সে প্রাণপণে হাতটা বাড়িয়ে দিল ভেসে থাকা বলটার দিকে। ঠিক তখনই আঁশটে জলের প্রথম ঝলকটা তার নাক—মুখ দিয়ে মসৃণভাবে ঢুকে গেল ফুসফুসের মধ্যে।

পাখির ডাক আর দূরগত বলির বাজনার শব্দ যখন তার কানে ফিরে এল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কাকু!

ভেসে ওঠা মৃতদেহটাকে মণিপুকুরের জল থেকে তুলে, অপেক্ষারত পুলিশের হাতে জিম্মা করে দিয়ে, জেলে দুজন

তাদের জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎই পেছন থেকে একটা বাচ্চার ডাক শুনে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, তিন চারটে কমবয়েসি ছেলে ভিতু ভিতু মুখ করে তাকিয়ে আছে। ওদের মধ্যেই একটা বাচ্চা আবার বলল, কাকু, ওটা আমাদের দাও না।

ছেলেটা আঙুল তুলে দেখাল জালের ভাঁজে আটকে থাকা লাল ক্যাম্বিসের বলটার দিকে।

না বাবা, ও জিনিস ছুঁতে নেই।

ওটা আমাদেরই বল। বিশ্বাস করো। কাল ওই মাঠে খেলতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তা হোক বাবা। মড়া মানুষের মুঠোর মধ্যে ছিল তো। এ জিনিস নিয়ে খেলতে নেই। বাড়িতে বোলো, নতুন বল কিনে দিতে।